POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 38

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18 Sep, 2025 25 রবিউল আওয়াল 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

নামায মানুষের রক্ষা কবচ। (এতে) পাঁচ ওয়াক্ত দোয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন দোয়া তো শোনা হবে। এই জন্য নামাযকে অতি যত্নসহকারে পড়া উচিত এবং আমার কাছে এটিই সব থেকে প্রিয় বিষয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

'রহমানিয়াত' এর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হলেন মহম্মদ (সা.)কেননা, মহম্মদ-এর অর্থ প্রশংসিত এবং রহমান এর অর্থ হল অযাচিতভাবে মোমেন কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্য দাতা। আর একথা স্পষ্ট যে, যে-সত্তা অযাচিতভাবে দান করবে, অবশ্যই তার প্রশংসা হবে। অতএব, মহম্মদ (সা.)এর সত্তায় রহমানীয়্যত'এর জ্যোতির্বিকাশ ঘটেছিল আর 'আহমদ' নামের মধ্যে রহীমিয়্যত এর প্রকাশ ঘটেছিল। কেননা রহীম এর অর্থ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার প্রতিদান দাতা আর আহমদ এর অর্থ প্রশংসাকারী। আর এটাও সাধারণ বিষয় যে, যে-যখন কোন ব্যক্তি কারোর ভাল কাজ করে, তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তার পরিশ্রমের প্রতিদান দেয় এবং তার প্রশংসা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদ নামের মাঝে রহীমিয়্যত' এর বিকাশ ঘটেছে। অতএব, আল্লাহ্‌ মহম্মদ (রহমান) এবং আহমদ (রহীম)। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার এই দুই মহান গুণ-'রহমানীয়্যত ও রহীমিয়্যত' এর বিকাশস্থল ছিলেন।"

* পৃথিবী এক রেলগাড়ি তুল্য আর আমাদের সকলকে বয়সের টিকিট দেওয়া হয়েছে। যার যেখানে গন্তব্য,তাকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়।অর্থাৎ সে মারা যায়। তবে মানুষ কোন জীবন নিয়ে এমন কল্প-বিলাস হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ আশার স্বপ্ন বোনে?

* নামায মানুষের রক্ষা কবচ। (এতে) পাঁচ ওয়াক্ত দোয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন দোয়া তো শোনা হবে। এই জন্য নামাযকে অতি যত্নসহকারে পড়া উচিত এবং আমার কাছে এটিই সব থেকে প্রিয় বিষয়।

*সূরা ফাতিহা সাতটি আয়াত এই জন্য রাখা হয়েছে যে, দোজখের সাতটি দরজা আছে। অতএব, প্রত্যেক আয়াত যেন একটি দরজা থেকে রক্ষা করে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০)

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

হযরত সাআদ বিন রাবি(রা.)-এর আত্মত্যাগের স্পৃহা।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বলেন: আমি যখন মদিনা আসি, তখন আঁ হযরত (সা.) আমার এবং সাআদ বিন রাবিয়ার মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। সাআদ বললেন-আমি আনসারদের মধ্যে বেশি ধনবান। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ আমি আপনার জন্য তাকে ত্যাগ করব। তার ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তার সঙ্গে নিকাহ করে নিন।' বর্ণনাকারী বলেন: একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বলেন; আমার এর প্রয়োজন নেই। এখানে কি কোনও বাজার আছে যেখানে বেচাকেনা হয়? তিনি উত্তর দিলেন কায়েনকার বাজার রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন- হযরত আব্দুর রহমান একথা জানার পর সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে যান এবং পনীর এবং ঘি নিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন: এভাবেই তিনি প্রতিদিন সকালে বাজারে যেতেন। কিছু দিন এভাবে কাটার পর একদিন তিনি ফিরে এলেন আর তাঁর গায়ে যাফরানের দাগ ছিল। রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন: আপনি কি বিয়ে করে নিয়েছেন? তিনি বললেন: আজ্ঞে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলেন; কার সঙ্গে? উত্তর দিলেন: আনসারের এক স্ত্রীর সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন: কত মোহর দিয়েছ? নিবেদন করলেন: একটি বীজ পরিমাণ সোনা কিম্বা একটি সোনার আংটি। নবী (সা.) তাঁকে বললেন- ওলীমার আয়োজন কর, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

কুকুর পোষার অনুমতি

২৩২২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন: যে কুকুর পোষে তার পুণ্যকর্ম থেকে প্রতিদিন এক 'কিরাত' পরিমাণ' হ্রাস পেতে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম সেই কুকুর যা শস্যক্ষেত বা পশুদের পাহারা দেওয়ার জন্য পোষা হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হারস ওয়াল মুনযারাহ)

এই আয়াতে 'উজেয়া লিন্নাস' বাক্যাংশে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত ছিল যে, এই গৃহের মাধ্যমে সেই সব মানুষদের পুনর্মিলন হবে যারা এক সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌ তা'লা বায়তুল্লাহকে 'বায়তুল আতীক' নামে আখ্যায়িত করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করেন নি, বরং পূর্বেই এর নির্মাণ হয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)এর সঙ্গে মিলে কেবল পূর্বের ভগ্নাবশেষের উপর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। যেমন হযরত হাজরা এবং হযরত ইসমাঈলকে ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহ তা'লার নিকট যে দোয়া করেন তার মধ্যে এই শব্দ আছে-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ।

(সূরা ইব্রাহিম: ৩৮)

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি।

এর থেকে জানা যায় যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর যুগের পূর্বেই বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা'লা এই আয়াতে সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿آل عمران:ركوع 10﴾

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তাহা হইল বাক্কাতে, উহা বরকতপূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ-সমগ্র জগতের জন্য। (আলে ইমরান: ৯৬)

এই আয়াতে 'উজেয়া লিন্নাস' বাক্যাংশে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত ছিল যে, এই গৃহের মাধ্যমে সেই সব মানুষদের পুনর্মিলন হবে যারা এক সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এক বিশ্বজনীন ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা তৈরী হবে। এবং এই গৃহ সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করার মাধ্যম হবে। যেমন মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.))এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করে দিয়েছেন আর এইরপে কাবাগৃহ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যম হয়েছে।

যাই হোক, বায়তুল্লাহ্‌ একটা অতি প্রাচীন স্থান। ইতিহাসও এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। যেমন- স্যার উইলিয়াম মিউর তার রচনা 'লাইফ অব মুহাম্মদ' এ লেখেন-মক্কার ধর্মের প্রধান নীতিগুলোকে এক অতি প্রাচীন যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। যদিও হেরোডেটাস এর ন্যায় প্রখ্যাত গ্রীক ভূগোলবিদ কাবার নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আরবদের প্রধান দেবতাদের মধ্য থেকে অন্যতম ইলা লাত এর কথা উল্লেখ করেছেন। (খোদাগণের খোদা) আর এটা একথার প্রমাণ যে, মক্কায় এমন এক সত্তার আরধনা করা হত যাকে প্রধান প্রধান প্রতিমাদেরও খোদা হিসেবে স্বীকার করা হত।

(তফসীর কবীর,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আঁ হযরত (সা.)-এর সরল ও সাধারণ জীবন

-সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর রচনা

আমাদের পথ-প্রদর্শক নবী আঁ হযরত (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শ নামে অভিহিত করেছেন। তাই তিনি আমাদের জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটিই সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তিনি নিজের কর্ম বিধি দ্বারা আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, পবিত্র ও পুণ্যময় প্রবৃত্তিকে কোনক্রমেই দমন করা বৈধ নয়, সেগুলিকে বরং আরও বিকশিত করা উচিত। আর যে সমস্ত আবেগের কারণে পাপ ও মন্দকর্মের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেগুলিকে গোপন না রেখে নিমূ ল করা আবশ্যক। অতএব আমরা যদি সংকোচ বশতঃ এমন কিছু বিষয় নিয়ে উল্লেখ না করি যেগুলি আমাদের ধর্মে র জন্য উপযোগী, তবে আমরা ভুল করছি। আর যদি আমরা সেই সমস্ত কথা যেগুলি বলা ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের জন্য বৈধ, সংকোচের কারণে বলি না, কিন্তু আসলে আমরা তার প্রতি আগ্রহী, তবে এটি কপটতা। আর যদি মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান অর্জনের জন্য নিজেকে কেউ নীরব ও গম্ভীর বানিয়ে রাখে তবে এটি শিরক। আঁ হযরত (সা.) -এর জীবনে এমন একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কারো জন্য সংকোচ বা কৃত্রিমতা করেছেন। বরং তাঁ র জীবন অত্যন্ত সরল এবং নির্বিবাদ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজের সম্মানকে মানু ষের হাতে মনে করতেন না, বরং সম্মান ও লাঞ্ছনার অধিকারী খোদাকেই জ্ঞান করতেন।

ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে কৃত্রিমতা

ধর্মীয় নেতাদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকে যে, তাদের ইবাদত এবং যিকর যেন অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। তারা বিশেষভাবে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়, যাতে মানুষ তাদেরকে অত্যন্ত পুণ্যবান বলে মনে করে মুসলমান হলে ওজুর বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিবে এবং বেশ সময় ধরে ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ধুতে থাকবে। অন্যদের ওজুর পানির ছেঁটা এড়িয়ে চলবে, সিজদা ও রুকু দীর্ঘ করবে। চেহারায় বিশেষ বিনয়ভাব প্রকাশ করবে এব অবিরাম ওযীফা পাঠ করতে থাকবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সব থেকে বেশি মুত্তাকি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মত খোদাভীতি কেউ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলিতে একেবারেই সাধারণ ছিলেন। তাঁর জীবন এই সব কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল।

শিশুর কান্না শুনে নামাযে শীঘ্রতা

আবি কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁহযরত (সা.) বলেছেন: আমি অনেক সময় নামাযে দাঁড়িয়ে নামায দীর্ঘায়িত করতে চাই, কিন্তু কোন শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই, এই ভয়ে যে পাছে শিশুর মাকে কষ্টে না ফেলি। কেমন সরলতার সঙ্গে তিনি বললেন, শিশুর কান্না শুনে নামায তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দিই। বর্তমান যুগের সুফীরা এমন বিষয়কে নিজের অসম্মান মনে করে, কেননা, তারা একথা প্র কাশ করাকে নিজেদের জন্য গর্ব মনে করে যে, আমরা নামাযে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে বুঝতেই পারি নি আর পাশে ঢোল বাজতে থাকলেও কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এই সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন, কোন মানুষ তাঁকে সম্মানীয় করে নি। এমন চিন্তাধারা তাদেরই যারা মনে করে যে মানুষ সম্মান দেয়।

জুতো পায়ে নামায

হযরত আনাসা (রা.) বর্ণনা করেন-যে, আঁ হযরত (সা.)কে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কি জুতো পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ পড়তাম।

এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কিভাবে কৃত্রিমতা এড়িয়ে চলতেন। এখন সেই যুগ আগত যখন কি না সেই সব মুসলমানরা যারা ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনবিহিত, তারা যদি কাউকে জুতো পায়ে নামায পড়তে দেখে তবে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তাদের ধারণা অনুসারে যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ না করে তারা বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) যিনি আমাদের জন্য আদর্শ তাঁর কর্মবিধি এমনটি ছিল না। বরং তিনি বিষয়কে ভালভাবে পর্য বেক্ষণ করতেন, তিনি কোন কৃত্রিমতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য পবিত্রতা একটি শর্ত, আর এটি কুরআন এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত। অতএব যে জুতো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাধারণত যে যে স্থানে নোংরা লাগার ভয় থাকে সেখানে যদি পরে না যায় তবে প্রয়োজনে সেই জুতো পরিহিতি অবস্থায় নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। আর এমনটি করে তিনি উম্মতের উপর এক বিরাট অনু গ্র হ করেছেন, তাদেরকে পরবর্তীকালের কৃত্রিমতা থেকে রক্ষা করেছেন। এই উত্তম আদর্শের দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়া উচিত যারা বর্তমানে এবিষয়গুলি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় আর কৃত্রিমতার পেছনের উন্মাদনা প্রকাশ করে। যে কাজের ফলে ঐশী মাহাত্ম্য এবং তাকওয়ার বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, সেই কাজ সম্পাদনে মানুষের সম্মানে কোন হেরফের ঘটে না

অনাহুতদের জন্য অনুমতি চাওয়া

হযরত ইবনে মাসুদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

এক আনাসারী সাহাবী ছিলেন যাঁর নাম ছিল আবু শোয়েব। তাঁর এক ক্রীতদাস ছিল যে কসাইয়ের কাজ করত। তাকে তিনি আদেশ দেন যে, আমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে চার সাহাবা সহ ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাব। এরপর তিনি রসুলে করীম (সা.)কেও আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠান যে, হুযুর (সা.) এবং চারজন সাহাবার দাওয়াত রয়েছে। তিনি (সা.) তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছিলেন তখন পথে আরও একজন সঙ্গ নেয়। তিনি (সা.) সেই সাহাবার বাড়ি পোঁছে বলেন, তুমি তো আমাদের পাঁচ জনের দাওয়াত করেছিলে।

এখন এই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে এসেছে। এখন বল যে, একেও ভিতরে আসার অনুমতি দিবে কি না? তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! অনুমতি আছে। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

এই হাদীসে থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) কিভাবে নিঃসংকোচে কোন বিষয় উপস্থাপন করতেন। হয়তো তাঁর স্থানে অন্য কেউ হলে চুপ করেই থাকত। কিন্তু তিনি (সা.) পৃথিবীর জন্য আদর্শ হয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি (সা.) প্রত্যেকটি বিষয়কে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে আমল করে দেখাতেন, আমাদের জন্য কঠিন হত। তিনি নিজের কর্মবিধি দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই মানুষের জন্য কল্যাণকর। এবং তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সম্মান কৃত্রিমতার মধ্যে নিহিত নয়, বরং তাঁর সম্মান খোদার পক্ষ থেকে ছিল।

সংসারের ব্যায় নির্বাহে সরলতা ও অমায়িকতা

তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিওছিল অতি সাধারণ। ধনীরা সাংসারিক খরচাদির বিষয়ে যে সমস্ত অপব্যায় ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত, তিনি সে সবের ধারে কাছেও যেতেন না। তিনি এমনসাধারণ জীবনযাপন করতেন যে,জগতের বাদশাহরা তা দেখেই বিস্ময়ে ডুবে যাবে। এবং এর উপর আমল করা তো দূরের কথা, ইউরোপের বাদশাহ হয়তো একথা স্বীকার করতেও রাজি নয় যে এমনও কোন বাদশাহ ছিল যার ভাগ্যে ধর্মীয় জগতের রাজত্ব ছিল আর জাগতিক রাজত্বে র দায়িত্বও পেয়েছিলেন; কিন্ত তা সত্ত্বেও নিজের খরচাদির বিষয়ে এমন মিতব্যায়িতা ও অমায়িকতা অবলম্বন করতেন। অথচ তিনি কার্পণ্য করতেন না, বরং পৃথিবীতে আজ অবধি যত উদার ও মহানুভব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, তিনি তাদের সকলের চেয়ে বেশি উদার ছিলেন।

ধনীদের অবস্থা

যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পত্তি এবং প্রাচুর্য দান করেন, তাদের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

জুমআর খুতবা

মক্কা বিজয়ের পরপরই মহানবী (সা.) প্রতিমাগুলোর সেই আস্তানাগুলো ধূলিসাৎ করার আদেশ প্রদান করেন, যেন মানুষের হৃদয় থেকে তাদের কাল্পনিক ভয় ও ভক্তির ধারণা দূরীভূত হয়, আর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। কেননা এগুলো ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় থেকে তাদের মিথ্যা ভয় ও প্রতাপ দূরীভূত হতে থাকে এবং তাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করে যে, সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার ধারণাই যথার্থ যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় যে-সব কুরাইশ সর্দার ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মাঝে সুহায়েলের চেয়ে বেশি নামায, রোযায় অভ্যস্ত এবং সদকা প্রদানকারী আর কেউ ছিল না।

মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার এসব নেতাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে নিজেদের জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের আলোকে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

চৌধুরী আব্দুল গফুর সাহেব (সিন্ধ) এবং মাননীয় মহম্মদ আলী সাহেব করতারপুর, ফয়সলাবাদ-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৮ আগস্ট, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৮ জহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জলসার পূর্বে মক্কা বিজয়ের ঘটনাসমূহের আলোচনা হচ্ছিল। কিছু কট্টর ইসলাম বিরোধী এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। তাদের মধ্যে আ রোকয়েকজন রয়েছে।ওয়াহশী বিন হারব তাদের একজন। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযাকে সে-ই শহীদ করেছিল এবং মক্কা বিজয়ের পর তায়েফে পালিয়ে যায়। যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে-ও এসে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৫)

বুখারীর বর্ণনায় ওয়াহশীর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ এভাবে রয়েছে, যা সে নিজে বর্ণনা করেছে। সে বলে, আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম, এমনকি সেখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আমি তায়েফ চলে যাই। লোকেরা আল্লাহ্ররসূল (সা.)-এর কাছে দূত পাঠায় এবং আমাকে বলা হয়, তিনি (সা.) দূতদের সাথে বিরোধ করেন না। সে বলে, আমিও তাদের সাথে বের হই এবং আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি ওয়াহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তুমি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, ব্যাপারটি তা-ই যেমনটি আপনি শুনেছেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমার পক্ষে কি সম্ভব যে, তুমি তোমার চেহারা আমার থেকে লুকিয়ে রাখবে? তিনি বলেন, একথা শোনার পর আমি সেখান থেকে বের হয়ে চলে যাই। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি ছিল যে, আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না, যেন আমার পুনরায় (হামযার হত্যার কথা) মনে পড়ে না যায়। এরপর যখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসাইলামা কাযযাব বিদ্রোহ করে; তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসাইলামার উদ্দেশ্যে বের হব যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি আর এর মাধ্যমে হযরত হামযার (হত্যার) প্রতিদান দিতে পারি। তিনি বলেন, আমিও লোকদের সাথে বের হই। অতঃপর তার (মুসাইলামার) অবস্থা যা হবার তা-ই হয়, অর্থাৎ সে নিহত হয়। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, একটি লোক দেয়ালের একটি ফাটলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন গোধুম রঙের একটি উট, মাথার চুল এলোমেলো। এটি মুসাইলামা কাযযাব ছিল যাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি দেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার দিকে আমার বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তার বুকের মাঝখানে নিক্ষেপ করি যা তার দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি বলেন, আনসারের একজন লোক তার দিকে ছুটে যায় এবং তার মাথার খুলিতে তরবারির আঘাত করে। এভাবে সে নিহত হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭২)

অনুরূপভাবে আমর বিন হাশিমের দাসী সারাহ ছিল একজন। সে একজন গায়িকা ছিল, যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁর কাছে কিছু চেয়েছিল ও দরিদ্রতার অভিযোগ করেছিল। তিনি (সা.) বলেন, তোমার গান-বাজনার কী হয়েছে? তুমি তো খুব গান গাইতে, টাকা কামাতে। সে বলে, মুশরিক নেতারা বদরের যুদ্ধে মারা যাবার পর থেকে তারা গান শোনা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি (সা.) তাকে এক উট বোঝাই করা খাদ্যশস্য দান করেন। তারপর সে কুরাইশের কাছে চলে যায়। ইবনে খাতাল তাকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা শেখাত এবং সে সেসব ব্যঙ্গাত্মক কবিতা গাইত। অর্থাৎ, এই পুরস্কার নেওয়ার পরেও সে তার কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয় নি। আর এই ছিল সেই মহিলা যার কাছে হযরত হাতিবের চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। যাহোক, সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে হযরত উমরের খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিল।

অনুরূপভাবে ইবনে খাতালের দাসী ফারতানা ছিল আরেকজন। সে-ও তাঁর (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা গাইত। সে-ও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৫)

তারপর হযরত হারেস বিন হিশামের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লেখা হয়েছে। তিনি মক্কার একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং আবু জাহলের পিতার দিক থেকে ভাই ছিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বোন তার স্ত্রী ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি এবং আবদু ল্লাহ্ বিন আবী রবীয়া হযরত উম্মে হানীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, কারণ হযরত আলী তাদের পেছন পেছন তাদেরকে হত্যা করার জন্য আসছিলেন। হযরত উম্মে হানী তাদের দুইজনকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছি। এতে তিনি (সা.) হযরত উম্মে হানীকে বলেন, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাকে আমরাও আশ্রয় দিলাম। (সীরাত হালবিয়া, পৃ: ১৩৩-১৩৪)

হারেস বিন হিশাম বর্ণনা করেন, আমরা দুইদিন সেই ঘরে অবস্থান করি। এরপর আমরা আমাদের ঘরে চলে যাই। আমরা আঙিনায় বসে ছিলাম,কেউ আমাদের সাথে বিরোধ করত না; আমাদের (কেবল) হযরত উমরের ভয় হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি চাদর পরে আমার দরজায় বসে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ হযরত উমর চলে আসেন, তার সাথে কিছু মুসলমান ছিল। তারা সালাম করে চলে যায়। তিনি বলেন, আমার লজ্জা লাগত যে, মহানবী (সা.) আমাকে দেখবেন ; কারণ তিনি (সা.) আমাকে সর্ব ত্র মুশরিকদের সাথে দেখেছিলেন। তারপর আমার তাঁর (সা.) দয়া, করুণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কথা মনে পড়ে। আমি তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করি। সে সময় তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছিলেন। তিনি আমার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁকে (সা.) সালাম করি এবং কলেমা শাহাদাত পাঠ করি। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, যিনি তোমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তোমার মতো মানুষ কীভাবে ইসলাম থেকে দূরে দূরে ছিল! হারেস বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি দেখে নিয়েছি যে, ইসলাম থেকে দূরে থাকা যায় না।

(সীরাত হালবিয়া, পৃ: ১৩৩-১৩৪) (আমতা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৯) (সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫০) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৪-৬৪৫)

অনুরূপভাবে রয়েছে সুহায়েল বিন আমরের ইসলাম গ্রহণ। তিনিও মক্কার একজন নেতা ছিলেন এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি করার জন্য কুরাইশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। সুহায়েল বিন আমর বর্ণনা করেন, যখন মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন এবং বিজয়ী হন তখন আমি আমার ঘরে চলে যাই। আমি দরজা বন্ধ করে দিই। আমি আমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর (সা.) সমীপে প্রেরণ করি যেন সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমার জন্য নিরাপত্তা চাইতে পারে। আমার ভয় ছিল, পাছে আমাকে হত্যা করে ফেলা হয়! হযরত আবদুল্লাহ্‌ তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা আপনার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন। মক্কাবাসীদের তো সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিলই; আসলে এরা ছিল সেসব নেতৃ স্থানীয় কাফির এবং এত কট্টর বিরোধী, যারা আশ্বস্ত হতে পারছিল না আর ভাবতেই পারছিল না যে, তারা নিরাপদ থাকবে। আর তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তা অনুযায়ী তাদের একটা আশঙ্কা লেগেই থাকত যে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে; যে কারণে সে তার ছেলেকে দ্বিতীয়বার তাঁর (সা.) কাছে পাঠিয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, সে আল্লাহ্‌ তা'লার নিরাপত্তার সাথে শান্তিতে আছে। সে সামনে আসুক , অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করুক। মহানবী (সা.) তাঁর চারপাশে বসা সাহাবীদের বলেন, তোমাদের মধ্যে যার সুহায়েলের সাথে দেখা হবে সে যেন তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখে। সুহায়েলের মতো বুদ্ধিমান ও সম্মানিত ব্যক্তি বেশি দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারবে না। সে দেখে নিয়েছে যে, যে অবস্থায় সে ছিল সেটা তার জন্য লাভজনক নয়, অর্থাৎ কুফরের অবস্থা। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ নিজের পিতার কাছে যান এবং তাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মন্তব্য সম্পর্কে বলার পর সুহায়েল বলে, খোদার কসম! তিনি শৈশবেও অনুগ্রহকারী ছিলেন এবং এ বয়সেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করছেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.)।

হযরত সুহায়েল নিরাপদে যাতায়াত করতে থাকেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন; হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। হুনায়নের যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জি'রানা নামক স্থানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, যা মক্কা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বলে কথিত আছে; এটি তায়েফ যাওয়ার পথে একটি কূপ।

(সীরাত হালবিয়া, পৃ: ১৪৬) (আমতাউল আসমা, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৮৬) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৮৮)

ইসলাম গ্রহণের পর তার মাঝে অভাবনীয় আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়। লেখা আছে, মক্কা বিজয়ের সময় যে-সব কুরাইশ সর্দার ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মাঝে সুহায়েলের চেয়ে বেশি নামায, রোযায় অভ্যস্ত এবং সদকা প্রদানকারী আর কেউ ছিল না। তিনি (নামাযে) অধিক ক্রন্দন ও আহাজারি করতেন, কুরআন পড়ার সময় প্রায়ই কাঁদতেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৬)

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় দেখেছি, সুহায়েল বিন আমর (পশু) জবাই করার স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর পশুগুলোকে তাঁর (সা.) কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। মহানবী (সা.) নিজের হাতে সেগুলো জবাই করেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করার ব্যক্তিকে ডাকেন এবং নিজের চুল মুণ্ডন করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখি, সুহায়েল মহানবী (সা.)-এর কর্তিত চুলগুলো নিজের চোখে স্পর্শ করান। তিনি (রা.) বলেন, সেসময় আমার মনে পড়ে গেল, এই সুহায়েল হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-কে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে বাধা দিয়েছিল, যা চুক্তির ওপর লেখার কথা ছিল। আর 'মুহাম্মদ' শব্দের সাথে 'রসূল' লেখারও বিরোধী ছিল এবং 'রসূলুল্লাহ্‌' শব্দটি মুছে না দেওয়া পর্যন্ত সে চুক্তি লেখা আরম্ভ করে নি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌ তা'লার প্র শংসা ও গুণকীর্তন করি- যিনি সুহায়েলকে ইসলামের পানে হিদায়াত দিয়েছেন। আর এমনভাবে হিদায়াত দিয়েছেন যে, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরম উন্নতি করেছেন। (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

সুহায়েল বিন আমরের আরেকটি কীর্তির কথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বলা হয়, সুহায়েল কুরাইশের মাঝে একজন প্রখ্যাত বক্তা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে কাফির হিসেবে মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। তিনি নিজের ঠোঁটে একটি দাগ তৈরি করে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) এহেন অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর নিকট আবেদন জানান, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সামনের দাঁত দুটি উপড়ে দিন, যেখানে সে দাগ দিয়েছে। তাহলে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়াতে পারবে না। তার দাঁত উপড়ে ফেলুন, মুখে দাঁত না থাকলে ভালোভাবে কথা বলতে পারবে না।

তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। সে সময় খুবই সন্নিকটে যখন সে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হবে আর তুমি তার প্রশংসা করবে। হযরত উমর (রা.) তো তাকে শাস্তি প্রদান করাতে চাচ্ছিলেন;কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না, কিছু বোলো না। এমন এক সময় আসবে যখন সে একস্থানে দাঁড়াবে এবং এমন বক্তব্য প্রদান করবে যে, তোমরা তার প্রশংসা করবে। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় সেই মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়। মক্কাবাসীরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কুরাইশ যখন মক্কাবাসীদের মুরতাদ হতে দেখে এবং হযরত আত্তাব বিন আসীদ উমুভী যখন লুকিয়ে পড়েন- যিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে মক্কার আমীর নিযুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ ভীষণ খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত সুহায়েল বিন আমর বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান এবং বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রথম পরিত্যাগকারী হয়ো না। খোদার কসম! এ ধর্ম এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করবে যেভাবে চন্দ্র ও সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এভাবে তিনি অর্থাৎ হযরত সুহায়েল (রা.) একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন আর এই বক্তৃতা মক্কাবাসীদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে এবং তারা বিরত হয়। হযরত আত্তাব বিন আসীদ (রা.)- যিনি লুকিয়ে পড়েছিলেন, তাকেও ডেকে আনা হয় এবং কুরাইশ সদস্যরা ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৫)

এরপর হযরত উতবা এবং মুআত্তেব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রসঙ্গে লেখা আছে, হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) যখন মক্কায় আসেন তখন তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ভাতিজা আবু লাহাবের ছেলে উতবা এবং মুআত্তেব কোথায়? আমি বলি, আমি তাদের দেখি নি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি তাদের দেখছি না, তারা কোথায়? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তারা অন্যান্য মুশরিকের মতো পাশ কেটে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। হযরত আব্বাস বাহনে চড়ে উরানা যান, যা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা, এবং তাদেরকে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়ই বয়আত করেন। অতঃপর তিনি (সা.) দাঁড়ান, তাদের হাত ধরেন এবং মুলতাযাম-এ নিয়ে আসেন, অতঃপর কিছু সময় দোয়া করেন এবং ফেরত চলে আসেন। মুলতাযাম হলো হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী বায়তু ল্লাহ্‌র প্রাচীরের অংশ, যে স্থান জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত আর এটি দোয়া কবুলের একটি বিশেষ স্থান। তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাকে খুশি রাখুন। আমি আপনার চেহারায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার প্রতিপালক-প্রভুর নিকট আমার চাচার দুই ছেলেকে চেয়েছিলাম আর তিনি আমাকে তাদের দান করেছেন।

(সুবুলুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫০) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৯)

এরপর সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা রয়েছে। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা ছিল মক্কার নেতা উমাইয়্যা বিন খালফের ছেলে। অজ্ঞতার যুগে সে কুরাইশের অভিজাতদের একজন ছিল এবং কুরাইশের বাগ্মী লোকদের একজন ছিল আর ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে মক্কায় মুসলমানদের দুঃখকষ্ট প্রদানকারী ও নিপীড়নকারীদের একজন ছিল। বদরের যুদ্ধের পর সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং উমায়ের বিন ওয়াহাবকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল।

যদিও তার নাম তাদের মধ্যে ছিল না যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই এই ভয় ও আশঙ্কায় মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল যে, তাকে হয়তো হত্যা করা হবে। সে লোহিত সাগরের দিকে, জেদ্দার পথে পালিয়ে যায়। উমায়ের বিন ওয়াহাব যে-কিনা তার বন্ধু ছিল এবং সে ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। তিনি সেই উমায়ের, যাকে সাফওয়ান এটি বলে মদীনায় পাঠিয়েছিল যে, তুমি যদি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করো তাহলে তোমার সন্তানসন্ততির দেখাশোনা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার। কিন্তু উমায়ের যখন মদীনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.) তার পুরো পরিকল্পনার কথা জেনে যান এবং উমায়ের এই মু'জিযা দেখে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন মক্কা বিজয়ের সময় উমায়ের তার বন্ধু সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী ও চিন্তিত ছিলেন। হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সাফওয়ান আমার জাতির নেতা। সে আপনার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করুন। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তিনি অনুরোধ করলেন, আপনি আমাকে এমন একটি চিহ্ন প্রদান করুন যা আমি তাকে নিরাপত্তার প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারি। মহানবী (সা.) নিজের পরিহিত পাগড়ি খুলে তাকে দেন। হযরত উমায়ের সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সাফওয়ানের কাছে এমন সময়ে গিয়ে পৌঁছান যখন সে নৌকায় আরোহণ করতে যাচ্ছিল। হযরত উমায়ের (রা.) তাকে বলেন,

আমি এমন এক সত্তার নিকট থেকে এসেছি যিনি সব মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আমি তোমার জন্য মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি। সাফওয়ান বলল, আমি তোমার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত যাব না যতক্ষণ না তুমি আমাকে এমন কোনো চিহ্ন দেখাবে যা আমি চিনি। এতে তিনি (রা.) তাঁর (সা.) দেওয়া পাগড়ি দেখান। সাফওয়ান হযরত উমায়েরের (রা.) সাথে ফেরত আসে। সে যখন রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন তিনি (সা.) মসজিদে সাহাবীদেরকে আসরের নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন তিনি সালাম ফেরালেন তখন সাফওয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! উমায়ের আমার কাছে আপনার চাদর নিয়ে এসেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি (সা.) বললেন, একেবারে সঠিক। সে বলে, আমাকে দুই মাসের সময় দিন, আমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে চাই না। তিনি (সা.) বলেন, চার মাস সময় দেওয়া হলো। আশা করছি, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে। সাফওয়ান মুশরিক অবস্থাতেই মক্কায় বসবাস করতে থাকে। যখন মহানবী (সা.) হাওয়াযিন অভিমুখে যান এবং তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করেন, তখন তিনি (সা.) সাফওয়ানকে দেখেন- সে সেই গিরিপথটি দেখছিল যেটি ভেড়া ও ছাগল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে অপলক দৃষ্টিতে সেটি দেখছিল। রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-ও সাফওয়ানকে দেখছিলেন যে, সে সেই উপত্যকাটি দেখছে যেটি সম্পদে পূর্ণ। তিনি (সা.) বলেন, এই উপত্যকা কি তোমাকে বিস্ময়ে ফেলে দিয়েছে যে, এই উপত্যকায় কত সম্পদ রয়েছে! সাফওয়ান বলে, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, এই উপত্যকা এবং এতে যা কিছু রয়েছে সব তোমার ; এগুলো নিয়ে যাও। সাফওয়ান এ সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে, যে উত্তম পদ্ধতিতে নবীর আত্মা দান করতে পারে সেভাবে অন্য কেউ পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়াকোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। সেই স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাফওয়ান মক্কায় ৪২ হিজরী সনে হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমানের (রা.) বিশৃঙ্খলা ও শাহাদাতের সময়ে শাহাদাত বরণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৩৫) (ফতেহ মক্কা, পৃ: ৩২১-৩২৫) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪-২৫) (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৯৭) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৪৯)

মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার এসব নেতাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে নিজেদের জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে একবার মক্কা আগমন করেন। শহরের বড়ো বড়ো নেতৃবৃন্দ যারা বিখ্যাত বংশের ছিলেন- তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাদের ধারণা হলো, হযরত উমর (রা.) আমাদের বংশ সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। এখন যেহেতু তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান, তাই তিনি আমাদের বংশের সম্মান রক্ষা করবেন আর আমরা আমাদের হারানো সম্মান ফেরত পাবো। তারা আসেন এবং হযরত উমর (রা.)-র সাথে কথা বলতে থাকেন। তারা কথা বলছিলেন, এমন সময়ে হযরত উমরের (রা.) বৈঠকে হযরত বেলাল (রা.) আসেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত খাব্বাব (রা.) আসেন, আর এভাবে প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারী ক্রীতদাসেরা একের পর এক আসতে থাকেন। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ঈমান এনেছিলেন, সেসব ক্রীতদাস একের পর এক আসতে থাকেন। তারা সেসব ব্যক্তি ছিলেন যারা এসব নেতৃবৃন্দের অথবা তাদের পিতৃপুরুষদের ক্রীতদাস ছিলেন। নেতৃবৃন্দ বসে ছিলেন। যারা এসেছিলেন তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ক্রীতদাস ছিলেন- যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। যখন তারা ক্রীতদাস ছিলেন তখন নিজেদের ক্ষমতার যুগে এরা তাদের প্রতি ভয়ঙ্করতম অত্যাচার করত। হযরত উমর (রা.) প্রত্যেক ক্রীতদাসের আগমনে তাদের স্বাগত জানান। অর্থাৎ যারা অতীতে ক্রীতদাস ছিল আর বর্তমানে সম্মানিত, তাদের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, হযরত উমর (রা.) প্র ত্যেক ক্রীতদাসের আগমনে এভাবে অভ্যর্থনা জানান যেন তারা নেতা। আর নেতাদেরকে বলেন, আপনারা কিছুটা পেছনে সরে যান। নেতারা সভায় সামনের দিকে বসতো। কিন্তু যখন এই পুরোনো ঈমান আনয়নকারীরা আসছিলেন তখন তিনি (রা.) সেসব নেতাদের বলছিলেন, কিছুটা পেছনে সরে যাও আর তাদেরকে সামনে বসতে দাও। এমনকি সেসব তরুণ নেতা যারা হযরত উমরের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, পেছনে যেতে যেতে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই যুগে তো কোনো বড়ো বড়ো হলঘর হতো না, বরং ছোটো কক্ষ হতো। আর যেহেতু সবার এতে সংকুলান হতো না, তাই পেছনে যেতে যেতে সেসব নেতার জু তোর ওপর গিয়ে বসতে হলো। যখন মক্কার সেসব নেতা জু তোর স্থানে পৌঁছে যায় আর তারা নিজ চোখে দেখছিল, কীভাবে একজনের পর একজন মুসলমান দাস আসছিল আর তাদেরকে সামনের দিকে বসানোর জন্য সেসব মানুষকে অথবা নেতাদেরকে পেছনে সরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছিল। তারা এতে মনে কষ্ট পান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, সে সময় আল্লাহ্ তা'লা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, একের পর এক এমন মুসলমান এসে পড়েন যারা কোনো এক কালে কাফিরদের দাস ছিলেন। যদি একবার এসব নেতাকে পেছনে সরতে হতো, তাহলে হয়ত তারা (কষ্ট)অনুভবও করতেন না। কিন্তু যেহেতু বার বার তাদেরকে পেছনে সরতে হয়েছে, এজন্য তারা সহ্য করতে পারেন নি এবং উঠে বাইরে চলে যান। বাইরে বের হয়ে তারা পরস্পরকে এই বলে অভিযোগ করতে থাকেন, দেখলে! আজ কীভাবে আমাদের অপমান ও লাঞ্ছিত করা হলো? এক একজন দাস এলো আর আমাদেরকে পেছনে সরানো হলো, এমনকি আমরা জুতোর মাঝে গিয়ে পৌঁছেছি। এ কথার প্রেক্ষিতে তাদের মাঝ থেকে একজন তরুণ বলে ওঠে, এই কাজের জন্য দোষী কে? উমরের দোষ নাকি আমাদের পূর্বপুরুষদের দোষ? তোমরা যদি একটু চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবে, এই কাজে উমরের কোনো দোষ নেই; এর দায় আমাদের পূর্বপুরুষদের, যার শাস্তি আজকে আমরা পেলাম। কেননা আল্লাহ্ যখন নিজ রসূলকে প্রেরণ করেছেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা বিরোধিতা করেছে। কিন্তু আমাদের দাসরা তাঁকে গ্রহণ করেছে। আর তারা সকল প্রকার কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছে। অতএব যদি আজ আমাদের এই সভায় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, তার দায় উমরের নয় বরং এর দায় আমাদের। তার এই কথা শুনে অন্যরা বলে, আমরা মানছি, এটি আমাদের বাপদাদাদের অপরাধের ফল। কিন্তু অপমানের এই কলঙ্ক দূর করার কোনো উপায় আছে নাকি নেই? এ বিষয়ে তারা পরস্পর পরামর্শ করে দেখল যে, আমাদের বুদ্ধিতে কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না; তাই চলো, আমরা হযরত উমরের (রা.) কাছে জিজ্ঞেস করি, এর উপায় কী? তারা হযরত উমরের (রা.) কাছে আসেন আর বলেন, আমাদের সাথে যা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি ভালোভাবেই জানেন, আর আমরাও জানি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমি অপারগ ছিলাম। কেননা তারা সেসব লোক যারা মহানবী (সা.)-এর সভায় সম্মানিত ছিলেন। হতে পারে, তারা তোমাদের দাস ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সভায় তারা সম্মানিত ছিল। এ কারণে তাদের সম্মান করা আমার দায়িত্ব ছিল। তারা বলে, আমরা জানি এটি আমাদের অপরাধের পরিণতি। কিন্তু এই কলঙ্ক মোচনের কি কোনো উপায় নেই? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা এই যুগে যারা এখানে বসে আছি তারা সেই যুগের কথা চিন্তাও করতে পারি না। মক্কার নেতারা মক্কায় কী ধরনের প্রতাপ ও প্রভাব রাখত- তা আমরা এই যুগে অনুমানও করতে পারব না। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাদের বংশগত মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন। তিনি (রা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর মক্কাতেই বড়ো হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত উমর জানতেন, এসব তরুণের পূর্বপুরুষরা কী ধরনের সম্মানের অধিকারী ছিল। হযরত উমর (রা.) জানতেন, তাদের সামনে কেউ চোখ তুলে কথা বলারও সাহস করত না। তিনি (রা.) জানতেন, তাদের কী ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। যখন তারা একথা বলল তখন হযরত উমরের চোখে এসব ঘটনা ভেসে ওঠে আর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন তিনি আবেগে কথাও বলতে পারছিলেন না। তিনি (রা.) হাত উঠিয়ে উত্তর দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করেন। যার অর্থ হলো, উত্তরে অর্থাৎ সিরিয়ায় ইসলামী যুদ্ধ হচ্ছে। যদি তোমরা সেসব যুদ্ধে অংশ নাও, তাহলে হয়ত সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। অতঃপর তারা সেখান থেকে উঠে যায় আর ত্বরিত সেই যুদ্ধে যোগদানের জন্য যাত্রা করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের মাঝ থেকে একজনও আর জীবিত ফিরে আসেন নি। সবাই সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। আর এভাবেই তারা নিজেদের বংশের নাম থেকে লাঞ্ছনার দাগ দূর করেন। (তফসীরে কবীর, খণ্ড-১১, পৃ: ৯৭-৯৯)

বলা হয়ে থাকে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে এই নেতৃবর্গ প্রশংসনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয় তখন মুসলমানরা বিশেষ করে ইকরামা ও তার সাথিদের সন্ধান করে। তখন তারা কী দেখল! দেখল, সেই ব্যক্তিদের মাঝে বারোজন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন ইকরামা। একজন মুসলমান সৈনিক তাদের কাছে আসেন আর ইকরামাকে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখেন। তিনি বলেন, হে ইকরামা! আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি সামান্য পানি পান করো। ইকরামা মুখ ফিরিয়ে দেখেন, পাশেই হযরত আব্বাসের পুত্র হযরত ফযল (রা.) আহতাবস্থায় পড়ে আছেন। ইকরামা সেই মুসলমানকে বলেন,

আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারবে না যে, যারা মহানবী (সা.)-কে তখন সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন যখন আমি তাঁর চরম বিরোধী ছিলাম, তারা ও তাদের সন্তানরা পিপাসার্ত থেকে মারা যাবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব! [তাদের মাঝে একে অপরের জন্য আত্মত্যাগের এক নতুন উদ্দীপনা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল।] তাই প্র থমে তাকে অর্থাৎ হযরত ফযল বিন আব্বাস (রা.)-কে পানি পান করাও, আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। সেই মুসলমান হযরত ফযল (রা.)-এর কাছে যান। তিনি পরবতী আহত ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বলেন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও;আমার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন। তিনি সেই আহত ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি পরবতী আহত ব্যক্তির প্র তি ইশারা করে বলেন, আমার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। এভাবে তিনি যে সৈন্যের কাছেই যেতেন তিনি তাকে অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর কেউ পানি পান করতেন না। তিনি যখন সর্বশেষ আহত ব্যক্তির কাছে পৌঁছান ততক্ষণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি পুনরায় পূর্বের ব্যক্তির কাছে আসেন, এভাবে (পর্যায়ক্রমে) ইকরামা পর্যন্ত এসে পৌঁছান, কিন্তু তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৬, পৃ: ২৩০-২৩১)

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর এবং কতিপয় বড়ো বড়ো প্র তিমা ধূলিসাৎ করারজন্য মহানবী (সা.) সৈন্যদল গঠন করে প্রেরণ করেন। এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন এলাকা অভিমুখে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। মূলত এগুলো যুদ্ধবিগ্র হের জন্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের বার্তা পৌঁছানো আর কতিপয় স্থানে স্থাপিত প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করা, যেগুলো তওহীদ তথা আল্লাহ্‌রএকত্ববাদের ওপর ঈমান আনয়নের পথে এক প্র তিবন্ধক ছিল, যেগুলোর বানোয়াট ওকাল্পনিক ভীতি মানুষের অন্তরে বিরাজমান ছিল। আর এগুলো সম্পর্কে এরূপ ধারণা একঅদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল। আরববাসীদের অধিকাংশের হৃদয়ে তিনটি প্রতিমা বা দেবীর পরম মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। সেগুলোর নাম হলো, 'লাত', 'মানাত' এবং 'উযযা'।

লাত: এই দেবী তায়েফে ছিল; সমগ্র আরবে সেটির সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। মানুষ সেটির নাম নিয়ে শপথ করত আর এর বেদিতে পশু কুরবানী করত। আমর বিন লুহাই, যাকে আরবে প্র তিমাপূজার জনক মনে করা হয়, সে মানুষের অন্তরে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্ , আল্লাহ্ তা'লা শীতকাল তায়েফে লাতের সাথে আর গরমকাল উযযার সাথে অতিবাহিত করেন।

মানাত : আরবের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিমা ছিল। এটি সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকা 'কুদায়েদ'-এ মক্কা ও মদীনার মধ্যবতী স্থানে ছিল। আরবের অধিবাসীরা একে সম্মান করত আর এর বেদিতে কুরবানী করত। বিশেষ করে অওস ও খাযরাজ এটির এরূপ সম্মান করতযে, তারা মানাতের নামে ইহরাম বাঁধত। এর শ্রদ্ধা ও সম্মানকে দৃষ্টিপটে রেখে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ'ও করত না, হজ্জ করার সময় নিজের মাথা মুণ্ডন করত না, বরং ফিরে এসে মানাতের কাছে যেত আর সেখানে মাথা মুণ্ডন করত, অবস্থান করত। আর এটি না করলে তাদের হজ্জ অসম্পূর্ণ মনে করত।

উযযা- এটি নাখলার নিকটে স্থাপিত কুরাইশের সবচেয়ে বড়ো দেবী ছিল। তারা এর জন্য পশু কুরবানীর একটি স্থানও বানিয়েছিল যেখানে তারা কুরবানী করত। এর নামানুসারে তাদের (সন্তানদের) নাম রাখত এবং এর নামে কসম খেতো। আমর বিন লুহাইকে আরব ভূখণ্ডে প্রতিমাপূজার প্রবর্ত ক বলে মনে করা হয়। সে মানুষের হৃদয়ে প্র তিমা সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল, এর ফলে জনগণ এই প্রতিমাগুলোকে সাংঘাতিক ভয়ও পেত আবার অত্যন্ত ভক্তিও প্রদর্শন করত, যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাদের ধারণামতে, আল্লাহ্ তা'লা (নাউযুবিল্লাহ্) বিভিন্ন ঋতুতে এই প্রতিমাগুলোর কাছে দিনাতিপাত করতেন। মোটকথা, এ জাতীয় (বিকৃত) ধ্যানধারণা মানুষের হৃদয়ে উযযা দেবীর মাহাত্ম্য এমনভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যেভাবে কাবার সম্মুখে বিভিন্ন উপহার ও উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে আসা হতো , অনুরূপভাবে উযযা দেবীর সম্মুখেও নিয়ে আসা হতো। এটি সেই প্রতিমা- উহুদের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বিজয়ের আনন্দে যার নাম উচ্চারণ করে বলেছিল, '***ইন্না লানাল উযযা, ওয়া লা উযযালাকুম***' অর্থাৎ আমাদের আছে উযযা, আর তোমাদের কোনো উযযা নেই।

এমনিতে সাধারণত আরববাসী এই তিনটি দেবীকেই সম্মান করত, যদিও কুরাইশের জন্য উযযাবিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। লাত দেবী বনু সাকীফের জন্য (নির্ধারিত ছিল) আর মানাত দেবী অওস ও খাযরাজ গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।আরববাসীর ধারণামতে, এই তিনটিই নারী ছিল, অর্থাৎ দেবী ছিল। (আললউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২০২-২০৩,২০৭) (ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৩৯)

কুরআন করীম এ তিনটি দেবীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলে:

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿٢٠﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢١﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢٢﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٣﴾ اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٤﴾

অর্থাৎ: 'তোমরাও লাত ও উযযার অবস্থা (তথা খবর) শোনাও দেখি! (তারাও কিএরূপ?) আর এগুলো ছাড়া (এদের) তৃতীয় (তথা) মানাতেরও (খবর শোনাও)! কী! তোমাদের ভাগেই কি সব পুত্রসন্তান আর তাঁর ভাগে রয়েছে কেবল কন্যাসন্ত ান? এ যে এক ভীষণ অসম বণ্টন! এগুলো তো কেবল নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা তাদের দিয়ে রেখেছ। এদের সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।' তারা শুধু ধারণা এবং প্রবৃত্তির হীন কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে নিশ্চয় তাদের কাছে সঠিক পথনির্দেশনা এসে গেছে। (তবুও তারা অনুধাবন করে না।) (সূরা নজম: ২০-২৪)

যাইহোক, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পরপরই মহানবী (সা.) প্রতিমাগুলোর সেই আস্তানাগুলো ধূলিসাৎ করার আদেশ প্রদান করেন, যেন মানুষের হৃদয় থেকে তাদের কাল্পনিক ভয় ও ভক্তির ধারণা দূরীভূত হয়, আর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। কেননা এগুলো ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় থেকে তাদের মিথ্যা ভয় ও প্রতাপ দূরীভূত হতে থাকে এবং তাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করে যে, সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার ধারণাই যথার্থ যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেন।

প্রতিমাগুলো কীভাবে ধূলিসাৎ করা হয়েছিল, কীভাবে এদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলএবং এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, কোনো বিরোধিতা হয়েছিল কিনা- এ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনাবলি রয়েছে, সেগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

নামাযের পরে আমি দু টি গায়েবানা জানাযা পড়াবো যাদের মধ্যে একজন (ভারতের) হায়দ্রবাদের জামশোরো নিবাসী চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেবের পুত্র মুকাররম চৌধুরীআব্দুল গফুর সাহেব, যিনি বিরানব্বই বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি ছিলেন জমিদার বংশীয়। বাগোড়াকোট থেকে উনিশ শতকের শুরুর দিকে কোট আহমদীয়াতে স্থানান্তরিত হন। তার পিতা জামা'ত এবং খিলাফতের প্রেমে তাকে জাগতিক ও ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে কাদিয়ানে প্রেরণ করেন যেখানে চৌধুরী সাহেব পাকিস্তানে হিজরতের আগ পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাহাবীদের পবিত্র সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হন। চৌধুরী গফুর সাহেব এখানে (পাকিস্তানে) আসার পর চিনিওট ও রাবওয়াতে বাকি পড়াশোনা শেষ করেন। পরবর্তীতে করাচি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৩ সালে তিনি অবসরে যান। অতঃপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। উগান্ডাতে দুই বছর একটি প্রজেক্টে সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি আহমদীয়াতের একজন বীর সু পুত্র ছিলেন। সৃষ্টির সেবাকারী ও অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ভেদাভেদ ছাড়াই সকলের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন। নিজ অঞ্চলের কায়েদ ছিলেন। আনসারুল্লাহ্ সংগঠনেও অনন্য সেবা প্রদান করেছেন। দীর্ঘদিন হায়দ্রাবাদের সেক্রেটারি উমুরে আম্মা-র দায়িত্বও পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে নওয়াবশাহ্ ও নওশাহরু ফিরোজ জেলার আমীর হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি খুবই পরিশ্রমের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়ে রয়েছেন।

তার এক মেয়ে হুমায়রা সাহেবা বলেন, সৃষ্টির সেবা করাকে তিনি নিজ ব্যাংক ব্যালেন্স বলে গণ্য করতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। এমনঅগণিত আহমদী ও অআহমদী আছেন, তার মাধ্যমে যাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়েছে। কোনো ভেদাভেদ ব্যতিরেকে মুসাফির, অসুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং বিশাল অংকের অর্থও প্রদান করতেন। জামা'তের স্বার্থে আর্থিক কুরবানীর মানসিকতাও প্রাধান্য পেতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন শতবর্ষ জুবিলী উদযাপনের জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানান তখন তৎক্ষণাৎ 'লাব্বায়েক' বলে পরবর্তী দিনই রাবওয়াতে নির্মিত তার বাড়ি বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ পুরোটাই এ খাতে প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালে খলীফা নির্বাচিত হবার পর যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সিন্ধ অঞ্চলে সফর করেন তখন তিনি (রাহে.) হায়দ্রাবাদের কোট আহমদীয়ায় অবস্থিত তার বাড়িতেও যান।

অবস্থা মানুষের অগোচরে থাকে না। দরিদ্র থেকে দরিদ্র দেশেও আনুপাতিক হারে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। এমনকি বন্য ও বর্বর জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও কোন না কোন ধনী সম্প্রদায় থাকে। তাদের এবং অভাব-পীড়িতদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে তা কারো অগোচরে থাকে না। বিশেষত যে সমস্ত জাতিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তাদের ধনীদের জীবনে এমন বিলাসিতা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ থাকে যে তাদের ব্যায়বহুলতা সীমা ছাড়িয়ে যায় ।

আঁ হযরত (সা.) যে জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন সেই জাতিরও গর্ব প্রকাশ এবং আড়ম্বরতায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। আরব সর্দাররা এক বিরল জনঘনত্বের একটি দেশের অধিবাসী হওয়া সত্বেও কয়েক ডজন করে ক্রীতদাস রাখত এবং তারা গৃহের শোভা বৃদ্ধিতে অভ্যস্ত ছিল।

আরব সংলগ্ন ভূখন্ডে এমন দুটি জাতির বাস ছিল যারা নিজেদের শক্তির বিচারে তৎকালীন জ্ঞাত জগতের উপর রাজত্ব করত। একদিকে পারস্য প্রাচ্যের সভ্যতার বৈভব ও গৌরব সহকারে পুরো এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্ত ার করে ছিল। অন্যদিকে রোম পাশ্চাত্যের দর্প ও গৌরব নিয়ে সমগ্র ইউরোপ এবং আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই দুটি দেশ প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় বর্ত মান যুগের দেশগুলিকে যোজন যোজন পেছনে ফেলে দিত। সুখ-সাচ্ছন্দ এবং বিলাসিতার এমন এমন উপকরণ তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু কিছু বিষয়ে তারা বর্তমান যুগের থেকেও এগিয়ে গিয়েছিল। ভোগ-বিলাসের উপকরণ চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল যা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইরানের দরবারে সম্রাট যে মর্যাদা ও বৈভব নিয়ে সিংহাসনে বসতে অভ্যস্ত ছিল এবং তাদের গৃহে যে পরিমাণ ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম একত্রিত ছিল, 'শাহনামা'র পাঠকরা তা ভালভাবে বুঝতে পারবে। যারা ইতিহাসের পুস্তকে এই সমস্ত সাজ সরঞ্জামের বিষয়ে সবিস্তারে অধ্যয়ন করেছে, তারা তো বেশ ভালই অনুমান করতে পারবে। শাহী দরবারের কলিনেও মনিমাণিক্য লাগানো ছিল এবং বাগানের কারুকাজে পান্না ও মুক্তা খচিত কলিন দ্বারা দরবারের ময়দানকে শাহী বাগান সদৃশ বানিয়ে দেওয়া হত। হাজার হাজার সেবক এবং দাস ইরানের বাদশাহর সঙ্গে থাকত। সবসময় ভোগ-বিলাসেই তারা মত্ত থাকত।

রোমী বাদশাহও ইরানীদের থেকে কোন অংশে কম যায় না। ইরানের বাদশাহ্‌র এশীয় বৈভব ও মযার্দার বিপরীতে রোমী বাদশাহ পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য এবং বৈভবের অনুরাগী ছিল। যারা রোমীদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে তারা জানে যে, রোমান সাম্রাজ্য প্রাচুর্যের সময় কিভাবে খরচ করেছে।

অতএব, যে দেশে ক্রীতদাস রেখে রাজত্ব করাকে গর্ব বলে মনে করা হত এবং যা রোম ও ইরানের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, একদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করছিল, অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের চোখ ধাঁধানো সমৃদ্ধি তাদেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছিল, সেই আরবের মত দেশে জন্ম নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর বাদশাহ্‌ হিসেবে উত্তরণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত না হওয়া এবং পারস্য ও রোমের আকর্ষণের ছোঁয়াচ এড়িয়ে যাওয়া, আরবদের প্রতিমাগুলিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া-এগুলি কি এমন বিষয় যা দেখার পরও কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ তাঁর পবিত্র ও সত্যবাদীদের নেতা হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির বিষয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে? না এমনটি কখনোই হতে পারে না।

সংসারের কাজ নিজে করা

এছাড়াও তাঁর আশপাশে বাদশাহদের জীবনের দৃ ষ্টান্ত ছিল। কিন্তু তাদের জীবনের কোন প্রভাব তাঁর কোন কর্মে পড়ে নি যা তিনি করে দেখাতেন। এবিষয়টিও ভেবে দেখার যে, তাঁকে আল্লাহ্‌ তা'লা এমন পদমর্যাদা দান করেছিলেন যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য চিন্তাভাবনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। একদিকে রোম তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে এবং অন্যদিকে পারস্য তাঁর অগ্রসরমান সেনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং তারা উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল যে, এই প্লাবনকে প্রতিহত করার জন্য কি পরিকল্পনা করা যায়? সেই কারণে উভয় সাম্রাজ্যের দূতেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত এবং চিঠিপত্র আদান প্রদান আরম্ভ করেছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে দাপট দেখানোর জন্য নিজের সঙ্গে একদল ক্রীতদাস রাখা এবং প্রতাপান্বিত অবতারে আত্মপ্রকাশ করা তাঁর জন্যও আবশ্যক ছিল। কিন্তু তিনি কখনওই এমনটি করেন নি। ক্রীতদাসদের দল তো দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন কাজের জন্য তিনি কোন ভৃত্য বা সেবক রাখেন নি। নিজেই সব কাজ করে নিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে

হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রশ্ন করা হয় যে, নবী করীম (সা.) বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি (রা.) উত্তর দেন, তিনি (সা.) বাড়ির মহিলাদের সাহায্য করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি বাইরে চলে যেতেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি কিরূপ সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘরের কাজকর্মের জন্য কোন ভৃত্য ছিল না। অবসর সময়ে তিনি নিজেই বাড়ির সব কাজ স্ত্রীদের সঙ্গে করতেন।

কতই না সাধারণ জীবন যাপন ছিল। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌॥ কি অসাধারণ নমুনা। এমন কোন মানুষ কি পেশ করা যেতে পারে যার কাছে রাজত্ব আছে সে এমন নমুনা দেখাতে পারে যে, সংসারের কাজের জন্য একজন চাকরও নেই? যদি কেউ দেখাতে পারে তবে সে নিশ্চয়ই তাঁর কোন সেবক হবে। অন্য কোন বাদশাহ্‌ যে তাঁর দাসত্বের মর্যাদা রাখে না, সে এমন নমু না কখনোই প্রদর্শন করে নি। এমন মানুষও পাওয়া যাবে যে জগতের ভয়ে তাঁকে ছেড়েই দিয়েছে। এমনও আছে যারা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই এই জগতেরই হয়ে গেছে। কিন্তু এই নমুনা যেখানে জগতের সংশোধনের জন্য তার বোঝাও নিজের কাঁধে তু লে নিয়ে নিয়েছেন। আর দেশের শাসনভারও নিজের হাতে রেখেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা থেকে দূরে থেকেছেন এবং তার প্রতি অনু রক্ত হয়ে পড়েন নি, বাদশাহ হয়েও দরিদ্র হয়ে থেকেছেন। এই বৈশিষ্ট্য আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সেবকদের ছাড়া আর কারও মাঝে দেখা যায় না। যাদের কাছে কিছুই ছিল না, এমনকি নিজেদের থাকার ঘরও পেত না। আর শত্রুরা যাদেরকে শান্তি তে থাকে ত দিত না। কখনো কোথাও তো কখনো অন্য কোথাও যেতে হত- তাদের জন্য সাধারণ জীবনযাপন কোন উৎকৃষ্ট নমুনা নয়, যাদের কাছে কিছু ই নেই তারা কিভাবে বৈভবপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে? কিন্তু আরব দেশের বাদশাহ্‌ হয়ে নিজের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের মাঝে বিতরণ করা আর বাড়ির কাজকর্ম নিজের হাতে করা-এগুলি এমন বিষয় যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন মানু ষের মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারে না।

****

হাদীস

لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

মৃত্যুর আকাঙ্খা করো না।

কেননা, মৃত্যুর পর কর্মের ধারা ব্যহত হয় এবং সম্ভব মৃত্যুর আকাঙ্খা মনে আত্মহত্যার চিন্তার উদ্রেক ঘটাবে। মৃত্যুর আকাঙ্খা করার এও অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার নিয়ামতরাজির অস্বীকারকারী এবং সে মনে করে যে, ইহজগতে তার উপর খোদা তা'লার কোন অনুগ্রহ নেই।

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ভারত-এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান-এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্‌ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

ঈদুল আযহার খুতবা

৩১ শে মার্চ, ২০২৫

আমি জুমার খুতবায়ও যেমন বলেছিলাম, প্রকৃত মু'মিন এবং প্রকৃত তাকওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– যে-ব্যক্তি শুধু একবার ভাল কাজ করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং তা ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখবে এবং সবসময় পাপ থেকে বেঁচে চলবে। শুধুমাত্র পাপ থেকে দূরে থাকা তাকওয়া নয়, বরং নেক কাজকে অব্যাহত রাখাই প্রকৃত তাকওয়া।

তাই আজকের এই ঈদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা রমযানে যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা আমাদের জীবনে চালু রাখতে হবে। রমযানে আমরা আল্লাহ্‌র অধিকার ও তাঁর বান্দাদের অধিকার যথাযথভাবে পালন করেছি, ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি।

অতএব, ঈদ আমাদের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছে এবং একটি শিক্ষা দিয়েছে যে, আমাদের ভাল কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং খারাপ কাজগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের আল্লাহ্‌র অধিকারও পালন করতে হবে এবং তাঁর বান্দাদের অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। নেক কাজে অটল থাকতে হবে এবং সেগুলোকে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানাতে হবে, যাতে আমরা নিজেরাও এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

তাহলে আজ আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। যখন আমরা এই বিষয়ে ভাববো যে, রমযানে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজগুলো করেছি এবং এমনকি কিছু বৈধ কাজও আল্লাহ্ তা'লার জন্য ত্যাগ করেছি, তখন আমরা এর বরকত তখনই পেতে পারি যখন এগুলোকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিব। এবং যেমনটি আমি বলেছি, এই ঈদ হল সেই অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণের দিন, সেই প্রতিশ্রুতি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দিন যে, আমরা আল্লাহ্‌র জন্য যে কাজগুলো ত্যাগ করেছিলাম, আজ আল্লাহ্‌র অনুমতি অনুসারে সেসব বৈধ কাজ আমরা আবার করছি এবং এখন এগুলোকে আমরা আমাদের জীবনের অংশ বানিয়ে রাখব। আমরা যেমন আল্লাহ্‌র হক আদায় করব, তেমনই বান্দার হকও আদায় করব।

তাই আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন ও তার সাফল্য একজন মু'মিনের জন্য এই বিষয়ের মধ্যেই নিহিত যে, সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের অনুসরণ করে। আর এই আদেশ মানার জন্য আমাদের পরিপূর্ণ আনুগত্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করতে হবে, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও বরকত লাভ করতে পারি এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে পারি।

আজ যদি ঈদ উদযাপনের পর আমরা আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাই, যা রমযানের আগে আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের ছিল, বা আমাদের কেউ কেউ যে অবস্থায় ছিল, এবং আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত না থাকে, তাহলে এটি এমন একটি বিষয়, যা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। প্রকৃত মু'মিন তো সেই ব্যক্তি, যে নেক আমলে উন্নতি লাভ করে এবং এগিয়ে যেতে থাকে।

আজ আমাদের এই অঙ্গীকার করতেও হবে এবং এই অঙ্গীকার নবায়নের জন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। এই প্রতিশ্রুতির পুনর্নবীকরণের জন্যই আমরা ঈদের দিনে একত্রিত হই এবং আজও তাই হয়েছি। রমযানে যে সৎ কাজের দিকে আমাদের পদক্ষেপ এগিয়েছিল, এখন তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই আনন্দের মুহূর্তে আমরা একত্রিত হয়েছি, দোয়া করছি এবং খুশি উদযাপন করছি।

কেবলমাত্র নতুন পোশাক পরা বা ভাল খাবার খাওয়াই প্রকৃত আনন্দ নয়; বরং প্রকৃত আনন্দ হল এই যে, আল্লাহ্ আমাদের যে-সব নেক কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন, আমরা তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করছি। আমাদের সত্যিকারের আনন্দ তখনই হবে, যখন আমরা এই নেক কাজগুলো অব্যাহত রাখব এবং আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করতে থাকব।

অন্যথায়, আমরা যদি তা না করি, তাহলে আমাদের আজকের ঈদের আনন্দ কেবল বাহ্যিক ও সাময়িক হবে, যা আমাদের জীবন ও আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলবে না। কেবল খাওয়া-দাওয়া ও জীবন যাপন করাই কোন বড় বিষয় নয়, কারণ সাধারণ দুনিয়াদার মানুষও তা করে এবং এমনকি পশুরাও এই কাজগুলো করে। তাই এটি এমন কোন বিষয় নয় যা উল্লেখযোগ্য বা যা মানুষের প্রকৃত উপকারে আসে। একইভাবে, সাময়িক দুনিয়াবি আনন্দও প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার বয়ে আনতে পারে না।

একজন মু'মিন বা একজন প্রকৃত আহমদীর জন্য প্রকৃত কল্যাণ তখনই আসবে, যখন তার মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আসবে এবং সে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে নিজের মধ্যে এই পবিত্র পরিবর্তন এনে চিরদিনের জন্য তা নিজের জীবনের অংশ করবে। অন্যথায়, একজন আহমদী ও একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। একজন আহমদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি সমস্ত পাপ থেকে তওবা করবেন, নেকির পথে মনোযোগ দেবেন এবং নিজের জীবন পবিত্র করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে পরিবর্তন না আসে, তাহলে তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে কী পার্থক্য? বরং তোমরা দ্বিগুণ পাপের অপরাধী হবে। একদিকে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ এবং অন্যদিকে নিজের অবস্থা না বদলানোর পাপ। অন্যরা শুধুমাত্র নিজের অবস্থা না বদলানোর জন্য পাপের শিকার, কিন্তু তোমরা দ্বিগুণ পাপের বোঝা বহন করবে, কারণ তোমরা একটি অঙ্গীকার করেছ।

অতএব, ঈদের এই দিনে আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যে অঙ্গীকার করেছি, তা রক্ষা করাও আমাদের বড় দায়িত্ব। এই অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য আমাদের সচেতনভাবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আজকের দিনে আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করা উচিত– আমরা কি সত্যিই আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে প্রস্তুত? আমরা কি সত্যিই আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি?

সাধারণভাবে, ঈদুল ফিতরের দিন আমাদের এমন একটি চিত্র উপস্থাপন করা উচিত, যাতে দেখা যায় যে, এক মাসের রোযা পালনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌কে পেয়ে গেছি এবং আল্লাহ্‌কে লাভের পর আমাদের নেকির পথে আরও উন্নতি হওয়া উচিত। ঈদের দিন শুধু আনন্দের দিন নয়, এটি ইবাদতের দিনও। কারণ সাধারণ দিনে আমাদের ওপর পাঁচটি নামায ফরয থাকে, কিন্তু ঈদের দিনে আমাদের ওপর ছয়টি নামায ফরয হয়ে যায়।

অতএব, আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও এটি একটি বিশেষ দিন, যার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ যখন আমাদের ওপর এই ছয়টি নামায ফরয করেছেন, তার অর্থ হল, আজকের দিনে আমাদের ইবাদতের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এটি বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য, যাতে আমরা ভবিষ্যৎ জীবনে এই বিষয়টি স্মরণ রাখি যে, আমরা এই দিনে একটি অঙ্গীকার করেছিলাম এবং সেই অঙ্গীকারের আনন্দ উদযাপন করেছিলাম। আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে থাকব এবং আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলতে থাকব।

এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই মানুষের হক আদায় করতে হবে, কারণ মানুষের হক আদায় করাও এক ধরনের ইবাদত।

এজন্য আমাদের সবসময় এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, যদি আমরা এটি না করি এবং আমাদের ওপর যা অধিকার ছিল তা পূরণ না করি, যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে লাভের জন্য চেষ্টা না করি এবং তাঁকে না পাই, তাহলে শুধু আনন্দ করা কোন অর্থ বহন করে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (রা.) একজন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন, যে আল্লাহ্‌কে না পেয়ে শুধুমাত্র বাহ্যিক দুনিয়াবি বিষয়গুলিতে আনন্দিত হয়। এর উদাহরণ সেই পাগলের মতো, যে হীরা-জহরত এবং টাকার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে না এবং প্রতিটি চকচকে বস্তু বা কাঁচের টুকরোকে মূল্যবান মনে করে অথবা স্বচ্ছ পাথর পেয়ে ভাবে এটি খুব মূল্যবান। বাস্তবিক মূল্য কেবল সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারে, যে আসল হীরা এবং খাঁটি রত্ন চিনতে সক্ষম। একইভাবে, আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃত উপাসনা ও সৎকর্মের সঠিক মূল্যায়ন কেবল একজন সত্যিকারের মু'মিনই করতে পারে। এই পরিচয় অর্জন করতে হলে মানুষের আল্লাহ্‌র সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক। কেবল তখনই সে নিজেকে আত্মিকভাবে গড়ে তুলে খাঁটি হীরা ও মূল্যবান রত্নের মতো করে তুলতে পারবে, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন। অন্যথায়, একজন পাগল এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে না।

জাগতিক মানুষের জন্য দুনিয়ার সম্পদ অর্জনই মূল লক্ষ্য, এবং যখন আমরা এই দুনিয়াকে দেখি, তখন দেখতে পাই যে, তারা সম্পদকেই তাদের উপাস্য বানিয়েছে এবং এর জন্য নিজেদের জীবন নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তারা যদি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং অনেকে তো পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়।

আমি যখন ঘানায় ছিলাম, তখন দেখেছি যে একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এমনকি সে পাগলামির পর্যায়ে পোঁছে গিয়েছিল। সম্ভবত কোন দুনিয়াবি দুঃখ বা আর্থিক ক্ষতির কারণে সে পাগল হয়েছিল। সাধারণত এমনটাই হয়ে থাকে। তবে তার আচরণ ছিল এমন যে, সে সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল, যা থেকে বোঝা যায় যে সে হয়ত কোন আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছিল। সে টাকার জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইত, কিন্তু যদি কেউ তাকে কয়েন দিত, তবে সে নিত না। সে বলত, না, আমাকে নোট দাও, আমি শুধু নোটই নেব।

একদিন সে এদিক-ওদিক ঘুরছিল, তখন আমরা তাকে ডাকলাম এবং টাকা দিতে চাইলাম। কিন্তু সে বলল, "আজ আমার টাকার দরকার নেই, আজ আমার অনেক সম্পদ হয়ে গেছে।" আর তার 'সম্পদ' কী ছিল? সে সিগারেটের খালি প্যাকেট কেটে সেগুলোর স্তূপ বানিয়েছিল এবং বলছিল, "আজ আমার অনেক টাকা হয়েছে, আমার কাছে নোটের গাদা আছে, আমার প্রচুর সম্পদ হয়েছে।"

সে গাঁট বাঁধা কাগজের টুকরোগুলোকে আসল টাকা মনে করছিল এবং সেগুলোকে দেখিয়ে গর্বভরে বলছিল, "দেখো! আজ আমি কত ধনী হয়ে গেছি, আমার অনেক টাকা হয়েছে।" মানসিক অসুস্থতার কারণে সে কাগজের টুকরোগুলোকে আসল টাকা ভেবে আত্মতুষ্টি বোধ করছিল।

আসল বিষয় হল, একজন প্রকৃত মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হয় না। ঠিক যেমন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, কেউ যদি বাহ্যিক জৌলুস, উজ্জ্বল কাঁচের টুকরো কিংবা কাগজের টুকরো দেখে নিজেকে ধনী মনে করে, তাহলে তাকে পাগলই বলা হবে,

মানসিকভাবে অসুস্থ বলা হবে।একজন মু'মিনের প্রকৃত আনন্দ তখনই, যখন সে আল্লাহ্কে পায়, প্রকৃত সম্পদ লাভ করে, কাগজের টুকরো, নুড়ি পাথর বা কাঁচের টুকরোকে যদি কেউ রত্ন ও সম্পদ ভেবে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্ত।

একজন মু'মিন, যিনি রমযানের রোযাগুলোর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন এবং আজ ঈদ উদযাপন করছেন, তার উচিত এই চিন্তা করা যে তিনি সত্যিই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করছেন কি না। আল্লাহ্র কিছু কিছু নিদর্শন কি তিনি অনুভব করছেন? রমযানে কি তিনি প্রকৃত কোন উপকার লাভ করেছেন, নাকি শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্টই সহ্য করেছেন? তিনি যদি শুধুই বাহ্যিক কষ্ট সহ্য করে থাকেন এবং কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি না করতে পারেন, তাহলে তার অবস্থা সেই পাগলের মতোই, যে শুধুমাত্র কাগজের টুকরোকে সম্পদ মনে করে।

কিন্তু যদি সত্যিই তিনি কিছু লাভ করে থাকেন, তাহলে তার আল্লাহ্র সঙ্গে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। এই সম্পর্কই প্রকৃত ঈদের আনন্দের প্রকাশ হবে। ঈদ হবে এই অনুভূতির প্রতিফলন যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্কে পেয়েছেন। তখন এই ঈদ হবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক নতুন মাইলফলক, যা তাকে নতুন পথের দিকে পরিচালিত করবে,কারণ তিনি রমযানে আল্লাহ্কে পেয়েছেন আর আজ সেই লাভের আনন্দ উদযাপন করছেন।

অতএব, যদি আমাদের ঈদ এই উপলব্ধির সঙ্গে হয় যে, আমরা রমযানে আল্লাহ্কে লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছি, তাতে কিছু না কিছু অর্জন করতে পেরেছি, তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থেই সেই পথে চলতে সক্ষম হবো, যা আমাদের আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যায়। আমরা সেই প্রকৃত সম্পদ অর্জন করতে পারবো, যা আল্লাহ্র দরবার থেকে প্রদান করা হয় এবং যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্কে পেতে পারি।

যদি আমরা রমযানে আমাদের খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে ভাল কাজের দিকে অগ্রসর হতে পেরে থাকি, তাহলে আমরা সত্যিই প্রকৃত আনন্দ উদযাপনের যোগ্য। যদি আমাদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং আমরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করতে পেরে থাকি, তাহলে আমরা প্রকৃত ঈদের আনন্দের উপযুক্ত। যদি আমরা মানুষের হক আদায় করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা প্রকৃত আনন্দের অধিকারী এবং এই আনন্দের সঙ্গে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা এই আনন্দকে চিরস্থায়ী করার জন্য সবসময় এই ভাল কাজগুলো করে যাবো। যখন আমাদের মধ্যে এই গুণ থাকবে, তখন আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও অর্জন করতে পারবো।

মহানবী (সা.) বলেছেন যে, যখন বান্দা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে এবং নেকির পথে চলে, তখন আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশি হন।

তিনি আরও বলেন, একজন মানুষ যার মালপত্রসহ উট মরুভূমিতে হারিয়ে যায় এবং তার আর কোন উপায় থাকে না, সে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উটের খোঁজ করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে। যখন সে জেগে ওঠে এবং দেখে যে তার উট তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তখন যে অপার আনন্দ সে অনুভব করে, আল্লাহ্ তার বান্দা যখন তাঁর দিকে ফিরে আসে, তখন তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দিত হন।

একইভাবে, মহানবী (সা.) বলেছেন, একজন মা যখন তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পায়, তখন যে আনন্দ অনুভব করে, আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দিত হন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দিকে ফিরে আসে।

নিশ্চয়ই রমযান মাসে আমাদের মধ্যে যারা এই প্রচেষ্টা করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে রাজি করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সেই বরকত পোঁয়ে দেবেন, যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। আর যখন বান্দা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ্ খুশি হন। আর যখন এটি ঘটে, তখন এই আনন্দ প্রকাশ করার প্রকৃত অধিকারী আজ ঈদের দিন হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ঈদের দিন অবশ্যই এক বরকতময় দিন, কিন্তু এমন একটি দিন আছে যা এর চেয়েও বেশি বরকতময় এবং আনন্দের দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানুষ না সেই দিনের অপেক্ষা করে, না সেই দিনকে তেমনভাবে খোঁজে যেভাবে খোঁজা উচিত। যদি তারা সেই দিনের বরকত এবং গুণাবলি সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা এর মূল্য দিত। বাস্তবিকই, সেই দিন তাদের জন্য অত্যন্ত বরকতময় এবং সৌভাগ্যের দিন হতে পারত।

তিনি বলেছেন, সেই দিন কোন দিন, যা জুমার দিন এবং ঈদ দুটোর চেয়েও বেশি বরকতময়? তিনি বলেন, আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন হল তওবার দিন, যা সব ঈদের চেয়ে উত্তম। কেন? কারণ সেই দিনে মানুষের মন্দ কাজের রেকর্ড, যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং আল্লাহ্র ক্রোধের অধীনে এনে দিচ্ছিল, তা মুছে ফেলা হয় এবং তার গুনাহগুলো ক্ষমা করা হয়। বাস্তবিক অর্থে, এই দিনের চেয়ে বড় আনন্দের এবং ঈদের দিন আর কী হতে পারে, যে দিন তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম এবং আল্লাহ্র চিরস্থায়ী ক্রোধ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তওবা করা পাপী, যে আগে আল্লাহ্ থেকে দূরে ছিল এবং তার ক্রোধের শিকার ছিল, এখন আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং জাহান্নাম ও শাস্তি থেকে মুক্ত হয়।

তাই তিনি বলেছেন, রমযানের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা তওবার দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তোমরা তা গ্রহণ করেছ। আর যদি তওবা কবুল হয়, তাহলে সেটাই তোমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন। আজকের এই ঈদের দিন কেবল তার প্রকাশ যে আমরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করেছি, এবং আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেছেন। আর তার প্রকাশ হিসেবে আজ আমাদের বলা হয়েছে, তোমরা এই আনন্দ প্রকাশ করো, পরিষ্কার পোশাক পরো, সুগন্ধি ব্যবহার করো, ভাল খাবার খাও। কারণ আমি তোমাদের এই সুযোগ দিয়েছি, যাতে তোমরা নেক কাজ করার সৌভাগ্য পাও, আল্লাহ্র নৈকট্য পাও, মানুষের হক আদায় করতে পারো এবং তোমাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে পারো।

তিনি আরও বলেন, প্রকৃত তওবার জন্য প্রকৃত পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং অশুচিতা থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য, নইলে শুধুমাত্র মুখে তওবা উচ্চারণ করার মাধ্যমে কোন লাভ হবে না। তাই, যে দিন এমন এক বরকতময় দিন যে দিন মানুষ তার পাপাচার থেকে তওবা করে, আল্লাহ্র সঙ্গে সত্যিকার সন্ধি স্থাপন করে এবং তাঁর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে সন্দেহ নেই যে, সে সেই শাস্তি থেকে বাঁচানো হবে যা তার মন্দ কাজের প্রতিফল হিসেবে গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল। এভাবেই সে সেই জিনিস লাভ করবে, যার সম্পর্কে সে আশা বা প্রত্যাশাই করতে পারে নি।

তাহলে আমাদের উচিত এই চিন্তা নিয়ে ঈদ উদযাপন করা যে, এই রমযানে আমরা অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকেছি এবং ভাল কাজ গ্রহণ করেছি, যার মাধ্যমে আমি খাঁটি মন নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকেছি। প্রকৃত ঈদের দিন আমার জন্য তখনই ছিল, কারণ আমি আল্লাহ্র আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজকের দিনে আমি আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী এই আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।

অতএব, যদি সত্য তওবার পর কারও অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসার একটি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে, তবে তা একসময় বৃহৎ

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

আলোয় পরিণত হবে এবং চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে মানুষের হৃদয় আলোকিত হবে, সে পাপ থেকে বেঁচে যাবে, এবং ধীরে ধীরে তার প্রতিটি কাজ ও আচরণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হতে থাকবে। যখন একজন ব্যক্তি এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার পরিবেশেও এর প্রভাব পড়ে, তার স্ত্রী-সন্তানদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে, এবং এভাবেই সে অন্যদের উপকার করতে থাকে। আর যখন সে অন্যদের উপকার করে, তখন তার চারপাশে একটি শান্তিপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা নেকিতে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের উচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আর যখন তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাবে, তখন হাদিস অনুযায়ী, আল্লাহ্ বলেন, "আমার এত আনন্দ হবে যেমন একজন মানুষ তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া মাল ও বাহন ফিরে পেলে হয়, কিংবা যেমন এক মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেলে হয়।"

আজকের বিশ্ব নানা অপবিত্রতার মাঝে নিমজ্জিত। এমন পরিস্থিতিতে একজন মু'মিন যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্ তাকে বিপুল প্রতিদান দেন, কারণ সে খাঁটি মনে সমস্ত খারাপ পরিবেশ ত্যাগ করে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করে।

তাহলে, যদি আমরা এই বিষয়টি মনে রাখি, তবে শুধুমাত্র রমযানের দিনগুলোতেই নয়, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও আমরা এই নেক আমলগুলো অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব। আমরা কীভাবে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করব, কীভাবে আমরা তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করব, কীভাবে আমাদের সন্তানদের মধ্যেও এই কল্যাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখব, যা আল্লাহ্ আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন- এসব চিন্তা আমাদের থাকতে হবে।

আমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব এবং আল্লাহ্‌র জান্নাতের পথে এগিয়ে যাব। যখন আমাদের চিন্তাভাবনা এইরকম হবে এবং আমাদের চারপাশের পরিবেশেও এ ধরনের ভাবধারা গড়ে উঠবে, তখনই আমরা প্রকৃত ঈদ উদযাপন করব এবং আমাদের পরিবেশও সত্যিকারের ঈদের আনন্দ উপভোগ করবে। আমাদের পরিবার ও আমাদের সন্তানরাও তখনই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে পারবে।

এখন যদি এই গুণ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছি এবং সেই ঈদের উদ্দেশ্যও অর্জন করেছি, যার কারণে আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরা এই আনন্দে আমাদের বাহ্যিক অবস্থাকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছি এবং ভাল খাবারের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছি। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এই উদ্দেশ্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই, আমাদের নামায কায়েমকারী হই। যদি আমরা এর আগে মসজিদে তাহাজ্জুদ ও তারাবিহ পড়তে যেতাম, তাহলে এখন অন্তত বাড়িতেই কিছু সময় নফল নামায ও তাহাজ্জুদের জন্য দেওয়ার চেষ্টা করবো।

আমরা যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয়কারী হই, হুকুকুল ঈবাদ (বান্দার হক) আদায়কারী হই, পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারি। রোযার সময় যখন আমরা নেক কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম, আমরা যেন তা সারাজীবন বজায় রাখতে পারি। পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, শাশুড়ি-বউমার সম্পর্ক, ননদ-ভাবির সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, আহমদীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা বন্ধুদের মধ্যকার সম্পর্ক- এসবকে আমরা যেন একটি আদর্শ সম্পর্কের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মনে করেন যে এই লোকেরা আমার সন্তুষ্টির জন্য এসব করছে, তাই আমি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেবো।

যদি কেউ বলে যে তার দুনিয়াবি কোন ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তবে আল্লাহ্ বলেন, আমি তা পূরণ করে দেবো, যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টির জন্য মিটমাট করে নাও এবং ভালবাসা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াও। কারণ আল্লাহ্, যিনি অন্তরের অবস্থা জানেন, তিনি বুঝতে পারেন যে এই ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্য তার সম্পর্কগুলো উন্নত করার চেষ্টা করছে। আর যখন এই পরিবর্তন আসে, তখন এটি শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং চারপাশের পরিবেশেও এর প্রভাব পড়ে। অন্যান্য মানুষও বুঝতে পারে যে এই ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন এসেছে এবং নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে। নিশ্চয়ই সে এতে কোন উপকার পাচ্ছে, তাই সে এই পরিবর্তন গ্রহণ করেছে। যদি কোন লাভ না থাকতো, তাহলে কেউ কেন এই পরিবর্তন করতো?

এই পরিবর্তনের প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে। আল্লাহ্ করুন, তিনি যেন আমাদের মধ্যে এই পবিত্র পরিবর্তন ধাপে ধাপে সৃষ্টি করে যান এবং কখনও যেন এমন সময় না আসে, যখন আমরা রমযান থেকে পাওয়া এই পবিত্র পরিবর্তনগুলো হারিয়ে ফেলি এবং আল্লাহ্ থেকে দূরে চলে যাই। বরং আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এমন ব্যক্তি হই, যারা এই পরিবর্তনকে তাদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে ফেলে। তখনই আমরা প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হবো, তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বায়াতের হক আদায়কারী হবো, তখনই আমরা সমাজকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য কাজ করবো এবং তখনই আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারকারী হবো। আর এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এটাই একজন আহমদীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন।

দোয়া করতে থাকুন, আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত আহমদীদের তাঁর অনুগ্রহের চাদরে আচ্ছাদিত রাখুন। অনেক জায়গায় অনেক নিরুপায় আহমদী রয়েছেন যারা বিনা কারণে আইনের কবলে রয়েছেন। মিথ্যা আইনের কবলে যেমন পাকিস্তানে, যেখানে তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে ঈদের নামাযও আদায় করতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এমন সুযোগ প্রদান করুন যাতে তারা প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে পারেন, নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন এনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারেন এবং বাহ্যিক আনন্দও উপভোগ করতে পারেন, একই সাথে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার অধিকারও লাভ করতে পারেন।

এমন মানুষ হোন যারা একে অপরের অধিকার আদায় করেন এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আকর্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্ত কষ্ট দ্রুত দূর করে দিন। আজকের এই দিনে ঈদের নামায পড়ার কারণেও তারা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ভীতিকর অবস্থার মধ্যে তারা ঈদের নামায আদায় করেছেন, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে নামায পড়তে বাধ্য হয়েছেন। নিজেদের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামায পড়তে পারেন নি, বিভিন্ন স্থানে নামায আদায় করতে হয়েছে। করাচিসহ বিভিন্ন জায়গায় তাদের নামায পড়তে বাধা দেওয়া হয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা এসেছে, এমনকি মসজিদগুলোর ওপর হামলা চালানো হয়েছে অথচ হামলাকারীদের থামানোর পরিবর্তে আমাদের মসজিদগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত এই অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

অসুস্থ ভাইদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদের সুস্থতা দান করুন। যারা কোন না কোনভাবে মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন, যারা আর্থিক কুরবানী দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। যারা জামা'তের জন্য, ইসলাম প্রচারের জন্য আর্থিক কুরবানী দিচ্ছেন, আল্লাহ্ তাদের অফুরন্ত পুরস্কার দিন।

শহীদদের সন্তানদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদের ঈমান দৃঢ় রাখুন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কোরবানির পুরস্কার তাদের নসিব করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন একইভাবে ওয়াকফে-জিন্দাগীদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, তাদের ওয়াকফ কবুল করেন এবং প্রকৃত ওয়াকফে-জিন্দাগী হয়ে দ্বীনের খিদমত করার সৌভাগ্য দান করেন।

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন। বর্তমানে তারা কঠিন সময় পার করছে এবং দাজ্জালের শক্তিগুলো তাদের ক্ষতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানও দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা যেন ঈমানের দৃঢ়তা লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায়, যাতে তারা দাজ্জালের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বোধশক্তি দান করুন যাতে তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে। এই যুগে আল্লাহ্ যে মসীহ্ মাওউদকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে মেনে নেওয়ার সৌভাগ্য যেন তারা পায়, যাতে তারা প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দি থাকা আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন। শত্রুরা তাদের আনন্দ ম্লান করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের অপমানিত ও পরাজিত করুন। আমাদের ওপর তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকুক, যাতে আমরা প্রকৃত ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারি, আমীন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্যতার প্রমাণ এক মহা নিদর্শন–চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ

হাফিয সৈয়্যদ রসুল নিয়াজ, নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান

হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুসলমানদের আমলের অবস্থাযখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন ইসসলামের পতন শুরু হবে। অপরদিকে তিনি মুসলমান জাতিকে এই সুসংবাদও দান করেছিলেন যে, এমন সময় ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ্তা'লা ইমাম মাহদীকে আবির্ভুত করবেন। সেই মাহদীকে চেনার জন্য আঁ হযরত (সা.) কতিপয় নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন যাতে মসলমান জাতি সেই মাহদীর বয়আত করে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করতে পারে।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মহা নিদর্শন

ইমাম বাকের তাঁর হাদীসের সংকলন কিতাব সুনান দারেকুতনীতে নিম্নোক্ত হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মহম্মদ বিন আলি বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.)বলেছেন: নিশ্চয় আমাদের মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন আছে যা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি থেকে আজ পর্য ন্ত সংঘটিত হয় নি। রমযান মাসের গ্র হণের তারিখগুলির মধ্যে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হবে, অপরদিকে সূর্য গ্রহণের তারিখগুলির মধ্যেমধ্যবতী দিনটিতে সূর্য গ্রহণ লাগবে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিথেকে আজ অবধি এই ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

(সুনানে দারে কুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব সাফাতু সলাতু লখুসুফ ওয়াল কুসুফ)

অতীতের ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদেও এই নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন।

'এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে।'

(আল কিয়ামাহ: ৯-১০) এছাড়াও মুসলমানদের দু টিপ্রধান ফির্কা শিয়া ও সুন্নী উভয়ের গ্রন্থ হাদীসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শনকে মাহদীর আগমণের লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ

মুসলমানেরা, বিশেষ করে আলেম সম্প্রদায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে যখন কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করল, তখন ঐশী সাহায্যের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত বিনয়সহকারে আল্লাহ্র কাছে দীর্ঘদোয়া করলেন।

(নুরুল হক, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৮, পৃ: ১৮৪)

এই দোয়ার পর এক মাস সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই অনুনয়পূর্ণ দোয়া গ্রহণ করে চাঁদ ও সূর্যকে তাঁর সত্যতার স্বর্গীয় সাক্ষী বানিয়ে দেন। ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে চন্দ্রগ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখে (১৩,১৪,১৫) র মধ্য থেকে প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ই রমজান ১৩১১ হিজরী তথা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হয় এবং সূর্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখ (২৭,২৮,২৯)এর মধ্যে মধ্যবর্তী তারিখ অর্থাৎ ২৮ রমযান, মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালের এই একই মহান নিদর্শন আমেরিকা তথা পশ্চিম গোলার্ধেও প্রকাশিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজের সত্যতার স্বপক্ষে এই নিদর্শনটি উপস্থাপন করে লেখেন-'এই তেরোশ বছরে অনেকেই মাহদী হওয়ার দাবি করেছে, কিন্তু কারো জন্য এই স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি.....। সেই খোদার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তিনি আমার সত্যতার স্বপক্ষে আকাশে এই নিদর্শন প্রকাশ করেছেন..... আমি খানা কাবায় দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি যে এই নিদর্শনের দ্বারা শতাব্দী নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, এই নিদর্শন চতুর্দশ শতাব্দীতে এক ব্যক্তির সত্যতার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। অতএব নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে আঁ হযরত (সা.) চতুর্দশ শতাব্দীকে মাহদীর আবির্ভাব কাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।"

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৪২)

তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছেন

'ইসমাউ সাওতাস সামাউ জা-আল মসীহ জা-আল মসীহ।'

কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য

যখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেল, সেদিন বিশেষ করে মক্কাবাসীরা এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন যে এখন ইসলামের উন্নতির যুগ শুরু হল আর ইমাম মাহদী জন্ম গ্র হণ করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশেও আনন্দ উদযাপিত হয়। চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার পর সূর্যগ্রহন দেখার জন্য এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে গ্রহণের নামায পড়ার মানসে বেশ কিছু সাহাবা কাদিয়ানে এসেছিলেন। হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব বলেন "রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী দারে কুতনী ও ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে মাহদীর লক্ষণ হিসেবে বর্ণি ত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ হয়; সেই মাসেই যখন সূর্য গ্রহণ হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে, তখন আমরা দুই ভাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে এই ঐশী নিদর্শন দেখার এবং সঙ্গে নামায পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শনিবার বিকেলে লাহোর থেকে রওনা হই এবং প্র ায় রাত এগারোটা নাগাদ বাটালা এসে পৌঁছাই। পরের দিন (৬ এপ্রিল) সকাল সকাল গ্র হন অনু ষ্ঠিত হওয়ার কথা। ঝড় বইছিল আর মেঘের গর্জন সহকারে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে বয়ে আসা ঝড়ে ধুলোবালি চোখে পড়ছিল। ভালভাবে হাঁ টা যাচ্ছিল না। বিদ্যুতের ঝলকানিতেই রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে স্বদেশের বন্ধু মৌলবী আব্দুল আলি সাহেবও ছিলেন। সকলে মনস্থির করলেন, যে করেই হোক, আজ রাতেই কাদিয়ান পৌঁছতে হবে। তিন জন মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ এই দোয়া করেন যে হে আল্লাহ! যমীন আসমানের সর্ব শক্তিমান খোদা! আমরা তোমার অসহায় বান্দা। তোমার মসীহকে দেখতে যাচ্ছি, আর পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। শীতল রাত্রি। তুমিই আমাদের উপর দয়া কর। আমাদের পথ সুগম করে দাও আর উজান হাওয়া দূর করে দাও। দোয়ার শেষ শব্দটুকুও তখনও মুখ থেকে বের হয় নি, এর মাঝে ঝড়ের অভিমুখ বদলে গেল আর সামনের দিক থেকে না এসে আমাদের পিছনের দিক থেকে ঝড় বইতে শুরু করল এবং আমাদের পথ চলতে সহায়কের ভূমিকা নিল। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন বাতাসে ভেসে চলেছি। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আমরা নহর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এখানে এসে কয়েক পসলা বৃষ্টির সম্মুখীন হলাম। নহর সংলগ্ন একটি ছোট্ট দালান ছিল, আমরা সেখানে প্রবেশ করলাম। সেই সময় গুরুদাসপুর জেলার অধিকাংশ পথে দস্যুবৃত্তির ঘটনা ঘটত। দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলাম কোঠি খালি, সেখানে দুটি গোবর ঘুঁটে ও একটি মোটা আকারের ইট পড়ে ছিল। প্রত্যেকে একটি করে নিয়ে মাথার নীচে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর যখন চোখ খুলল, দেখলাম আকাশে তারা ফুটেছে। আকাশ পরিস্কার ছিল আর ঝড় ও মেঘের চিহ্নও ছিল না। এরপর আমরা পুনরায় রওনা হলাম এবং হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর দস্তরখানায় গিয়ে সেহরী করলাম।

সকালে মৌলবী মহম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী মসজিদ মুবারকের ছাদে নামায পড়ালেন। আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সূ র্য গ্রহণের নামায পড়লাম। প্রায় তিন ঘন্টা নামায ও ইত্যাদি অব্যাহত থাকল। অনেকে কাঁচের উপর কালি লাগিয়ে রেখেছিল, যার দ্বারা তারা গ্রহণ দেখতে ব্যস্ত ছিল। কেবল একটুখানি কালছায়া কাঁচের উপর পড়েছিল, তা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে কেউ জানাল যে সূর্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। তিনি কাঁচের মধ্যে দেখলেন, খুবই সূক্ষ্ম অন্ধকার দেখতে পেলেন। যা দেখে হুযুর (আ.) দুঃখ করে বললেন, এই গ্রহণ আমরা তো দেখলাম, কিন্তু তা এতটাই সূক্ষ্ম যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা দিবে না। আর এভাবে এক মহা নিদর্শন সংশয়পূর্ণ থেকে যাবে। হুযুর (আ.) কয়েকবার একথার উল্লেখ করেন। কিছু ক্ষণ পর অন্ধকারভাব বাড়তে শুরু করল, এমনকি সূর্যের সিংহভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

(আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯২-৯৪, বর্ণনা, হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব)

সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে বয়আত গ্রহণকারী সাহাবাদের ঘটনাবলী।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণী বেশ বিখ্যাত ও পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এই নিদর্শন যখন প্রকাশ পেল, তখন দুর্বৃত্তপরায়ন উলেমারা নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করল আর সাধারণ মুসলমানকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু হাজার হাজার পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমার জন্য চন্দ্র ও সূ র্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেল আর হাজার হাজার মানুষ এই নিদর্শন দেখে আমার জামাতের সামিল হল। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ আমার জন্য আনন্দ বয়ে এনেছে আর বিরুদ্ধবাদীর জন্য লাঞ্ছনা। তারা কি হলফ করে বলতে পারে যে, এম সময় যখন কিনা আমি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবি করছি, তারা কি মন থেকে মেনে নিত যে তখন সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হোক আর আরব দেশসমূহে এর চিহ্ন মাত্র প্রকাশ না পাক। আর যখন তাদের ইচ্ছে বিপরীতে সেই নিদর্শন প্রকাশ পেল, তখন নিশ্চয় তারা মর্মাহত হয়েছে এবং এতে নিজেদের অপমান দেখেছেন।"

(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩)

এই অসাধারণ নিদর্শন দেখে আহমদীয়াত গ্রহণকারী পুণ্যবানদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 18 Sep, 2025 Issue No.38

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর...)

১৯৮১ সালে রাবওয়াতে যখন কাসরে খিলাফত নির্মিত হচ্ছিল, সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আফ্রিকাতে কোনো প্রজেক্টের কাজে পাঠানো হচ্ছিল আর সেটি তার জন্য অনেক ভালো একটি সুযোগ ছিল। যখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সকাশে পরামর্শ লাভের জন্য উপস্থিত হন তখন তিনি (রাহে.) বলেন, সেখানেযেয়ো না; সেখানে যাবার চিন্তা বাদ দিয়ে এখানে আমাদের কাসরে খিলাফত নির্মিত হচ্ছে ও এর ছাদ স্থাপনের কাজ হচ্ছে– এর তত্ত্বাবধান করো। সুতরাং তিনি পরবর্তী দিনই কাজ বুঝে নেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও তাকে পুরস্কৃত করেছেন। যখন তিনি ছুটি কাটিয়ে ফেরত যান, তখন সরকারের পক্ষ থেকে সে চুক্তি তিনি পুনরায় লাভ করেন আর তিনি বলতেন, এটি কেবলমাত্র খিলাফতের কল্যাণে লাভ হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস ও রাবে (রাহে.)-র সাথেও তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তারাও তার নিকট যেতেন এবং তার বাসায় অবস্থানও করেছেন। অনুরূপভাবে আমি যখন পাকিস্তানে ছিলাম, তখন আমারও তার বাসায় যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং তার বাসায় অবস্থান করারও সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। বরং একবার তো সিন্ধ অঞ্চলে রাতে সফর করতে হয়েছিল আর পরিস্থিতিও স্বাভাবিক ছিল না। তিনি বলেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। রাতে বৃষ্টিও হচ্ছিল আর ঝড়ো বৃষ্টি ছিল, পথঘাট পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাহোক, তিনি আমাকে নিয়ে যান। আমাদের যে স্থানে যাবার কথা ছিল সেখানে রাতে আমরা পৌঁছে যাই। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আপনি রাতটা এখানেই থেকে সকালে যান, একা যাবেন না। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না। সে সময়ই নিজ গাড়িতে চড়ে রাতেই রওয়ানা হয়ে যান। অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্‌র পথে কারাবরণকারীদের জন্যও তার উল্লেখযোগ্য সেবা রয়েছে। বিভিন্ন জেলে গিয়ে ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করে তাদের জন্য সহজসাধ্যতার ব্যবস্থা করতেন।

তার মধ্যে মানবসেবার স্পৃহা অসীম ছিল। নিকটাত্মীয়দের খোঁজখবর নিতেন। তার মেয়ে বলেন, তিনি গরিব ও অভাবীদের সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যুগ-খলীফার প্রতিটি নির্দেশে লাব্বায়েক বলতেন। এমনকি তার দৈনন্দিন বিভিন্ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুই হতো খিলাফত। তার অআহমদী পরিচিতরাও তার বিভিন্ন ভালো কাজের বিষয়ে কথা বলেন। তার পুণ্যময় প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল। তার অনেক বন্ধু ছিল। আর সর্বত্র তিনি একজন আহমদী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সরকারী কর্মকর্তা, সিন্ধুরবড়ো বড়ো রাজনৈতিক বংশের ব্যক্তিবর্গের সাথে তার সু সম্পর্ক ছিল। আর তাদেরকে প্রায়শই জামা'তের প্রকাশিত কুরআন করীম দেখাতেন আর জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। এমনকি সম্ভব হলে তাদেরকে রাবওয়াতেও নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তা'লা মহুমেরপ্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যময় আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে ২৭৫ নং চক, করতারপুর, ফয়সালাবাদ নিবাসী মুকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেবের। ইনি সম্প্রতি সত্তর বছর বয়সে ইন্তে কাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তারও তিনজন পুত্র ও পাঁচজন কন্যা সন্তান রয়েছে। তার একজন পুত্র জাম্বিয়ার লুসাকা শহরের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ। যুক্তরাষ্ট্রের জলসায় অংশগ্রহণ করতে আসায় পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি।

মুবাল্লেগ সিলসিলাহ তাহের আহমদ সায়ফি সাহেব বলেন, আমার পিতার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা দ্বিতীয়খিলাফতের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে হয়েছে, যখন তার দাদা নুসরাত সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম নিয়মিত রোযা এবং নামাযে অভ্যস্ত, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, শান্ত প্রকৃতির, মিশুক, মানবসেবার স্পৃহায় নিবেদিতপ্রাণ, হাসিমুখে সবার সাথে সাক্ষাৎকারী, পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল। প্রত্যেক কাজের পূর্বে যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। জামা'তী এবং ধর্মীয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে নীরবে অংশগ্রহণ করতেন আর যতদূর সম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানীতেও অংশ নিতেন। এমটিএ-র যাত্রা যখন শুরু হয় তখন তার ঘরে টিভি ছিল না। তাই এমটিএ-র যাত্রা শুরু হতেই তৎক্ষণাৎ তিনি বাসায় টিভি নিয়ে আসেন যেন যুগ-খলীফার কথা সরাসরি শুনতে পারেন। তিনি (মরহুমের পুত্র) বলেন, যুগ-খলীফার কোনো তাহরীকে আমার বাবা অতি আগ্রহের সাথে অংশ নেন নি– এমন কোনো ঘটনা স্মরণ পড়ে না। অআহমদীদের সাথেও তার অত্যন্ত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। যেই কারখানায় তিনি চাকরি করতেন সেখানে অনেক অআহমদীকেও তিনি চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু কিছু অআহমদীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের কারো কারো মাঝে তেমন বিবেকবোধ থাকে না; তারপরও তিনি তাদের প্রতি সদাচরণ করেছেন। তারা বিভিন্ন মানুষের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে মালিকের কাছে অভিযোগ করে আর দাবি করে যে, তাকে যেন চাকরি থেকে বহিষ্কার দেওয়া হয়। যাহোক, তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়, তদুপরি তিনি কোনো হট্টগোল করেন নি। আল্লাহ্ তা'লার দরবারেই তিনি নিজের আবেদন জানান। কিছুদিন পর ফ্যাক্টরির মালিক পুনরায় তাকে ডাকে। আর সেখানে পূর্বের পদেই তাকে পুনর্বহাল করে। কিন্তু যারা তার সাথে এরকম অসদাচরণ করেছিল, তাদের সাথেও তিনি সদাচরণ করেন আর কাজ করে যান। (তার পুত্র) বলেন, তবলীগের চেয়েও বেশি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কারণেই ফয়সালাবাদ শহরের আটজন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরকেও তার এই পুণ্যময় আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

(১১ পাতার পর....)

অনেক ঘটনা রয়েছে। দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

১) হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন" অনেক দিনের কথা। সম্ভবত ১৯৬৬ সালের ঘটনা এটি। ওয়াকফে আরযি সূত্রে সরগোধা অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে এক পৌঢ়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। আমি নিজের আহমদী পরিচয় দিয়ে জানাই যে রাবোয়া থেকে আসছি। তখন সেই বৃদ্ধাও জানায় যে সেও আহমদী। তারা সেই যুগে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন দেখে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা-মা সেই সময় জীবিত ছিলেন। সেই বন্য অঞ্চলে, প্রত্যন্ত গ্রামে নিরক্ষর মানুষগুলোও চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ দেখে আহমদী হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই যুগেও অনেককে এই নিদর্শনের মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছিলেন।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩০ শে জুন, ২০০৬)

২) "হযরত গোলাম মহম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এই অধমের গ্রামে অনেক দিন আগে বদরুদ্দীন সাহেব নামে এক মৌলবী ছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স প্রায় পনেরো বছর ছিল। বান্দা মৌলবী বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়ির সামনে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, এমতাবস্থায় সূর্যকে গ্রহণ লাগে আর মৌলবী সাহেব বলে ওঠেন সুবহানাল্লাহ। মাহদী সাহেবের লক্ষণ প্রকাশিত হল এবং তাঁর আগমণের সময় হল। কিছুলকাল পরে মৌলবী সাহেব আহমদী হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পুণ্যবান ছিলেন। এক বছরের প্রচেষ্টায় তিনি নিজের স্ত্রী ও পিতামাতাকে আহমদী করেন।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২০ শে মার্চ, ২০১৫)

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শনকে অস্বীকার করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তরএই মহা নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া প্রায় ১২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এখনও প্রতিশ্রুত পুরুষের প্রতীক্ষায় রয়েছে। অতএব খোদার এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তর।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) বলেন- "যখন এই নিদর্শনাবলী পূর্ণ হচ্ছে, তখন মসীহ মওউদ এর আগমণের প্রতীক্ষা এখনও কেন? মসীহকে কেন কিয়ামতের সঙ্গে যোগ করার চেষ্টা করা হয়? কেবল একটিই জেদ ধরে বসে থাকা! আল্লাহই এদের বিবেক দিন। এছাড়াও একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে মসীহর আগমণের নিদর্শন হিসেবে, আর এটি এমন হাদীস যখন আহমদীরা সেটি উপস্থাপনকরে, এটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় না। আর সেটি হল সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস। আর এই নিদর্শনকে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে থাকি।....

একটি জলজ্যান্ত নিদর্শন যেটিকে চ্যালেঞ্জ হিবে উপস্থাপন করা হয়, ইমাম বাকের যার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, মসীহ মওউদ এ যুগে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। তা সত্ত্বেও মসীহ মওউদ এর আগমণের সময় এখনও হয়নি বলে দাবি করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তর।" (খু তবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতি ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও এই মহা নিদর্শনকে অনুধাবন করার এবং জগতের সকল জাতির প্রতিশ্রুত পুরুষকে গ্রহণ করার তৌফিক দিন। আমীন

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir